জাতীয় সংহতি প্রসঙ্গে

(দ্বিতীয় সংখ্যা)

অধ্যাপক শান্তিময় রায়

জাতীয় ঐক্য ও সংহতির সমস্যা ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী

ইদানিং কালে ভারতে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নটা একটা অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু কাজ করতে অনেকেই আগ্রহী কিন্তু এই সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব আমাদের কথাবার্তা ও কাজে অনেক সময়েই অত্যন্ত বেদনাদায়ক ভাবে প্রকাশ পায়।

প্রাক্-স্বাধীন ভারতে জাতীয় ঐক্যের সমস্যা বলতে আমাদের সামনে ছিল কেবলমাত্র হিন্দু ও মুসলমান বিরোধের সমস্যা। এই বিরোধ চূড়ান্ত পর্যায়ে ভারতকে বিভক্ত করল। এরই জের হিসাবে জাতির এক মহান সম্পদ মহাত্মা গান্ধীকে প্রাণ দিতে হ'ল উগ্র ধর্মান্ধ এক হিন্দু ব্রাহ্মণের হাতে। এর পরে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ অনেক কমে গেল ঠিকই কিন্তু তা নির্মূল হ'ল না। স্বাধীন ভারতে গত চল্লিশ বছরে এখানে সেখানে ছোট বড় বহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে গেছে এবং ভবিষ্যতেও এর সম্ভাবনা রয়ে গেছে।

এর পাশাপাশি স্বাধীন ভারতে নতুন করে দেখা দিল ভাষাগত বিরোধ, আঞ্চলিকতা প্রাদেশিকতা, জাতি-উপজাতি ভিত্তিক দ্বন্দ্ব ও বিরোধ, উগ্র শিখ ধর্মান্ধতা। এর কোন কোনটা হিংসাত্মক আন্দোলনের রূপ নিয়ে বহু জীবনহানী ঘটিয়েছে। কোনটা সন্ত্রাসবাদের পথ নিয়ে ভারত ভূখণ্ডকে অশান্ত করে তুলেছে আবার কোনটা বা ভারত থেকে বিচ্ছিন্নতার দাবি তুলে ভারতের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সামনে তুলে ধরেছে এক মারাত্মক চ্যালেঞ্জ।

এইসব বিভিন্ন ধরনের বিভেদকামী শক্তির কেন অভ্যুদয় ঘটেছে, কেন নতুন নতুন অঞ্চলে ও নতুন নতুন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব ও বিরোধ সঞ্চারিত হচ্ছে—এ বিষয়ে সঠিক ধারনা গড়ে তোলা যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন-এর সমাধানের পথ অর্থাৎ ভারতে ঐক্য ও সংহতি স্থাপনের উপায় সম্পর্কেও সঠিক উপলব্ধি গড়ে তোলা। এখানে আমরা একে একে বিভিন্ন ধরণের সমস্যার ঐতিহাসিক পটভূমিকায় পর্যালোচনা করে এর সঠিক কারণ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। প্রথমেই নেওয়া যাক হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিরোধের সমস্যাটিকে।

হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক ঃ

প্রাচীন ভারতে সৃষ্টি হয়েছিল হিন্দুধর্ম। অবশ্য এর মধ্যে ছিল নানা বৈচিত্র, ছিল অসংখ্য দেব-দেবী, ছিল শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, তান্ত্রিক, বৈদিক এবং পরবর্তীকালে জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মমত, বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন সম্প্রদায়। এইসব বাহ্যিক পার্থক্য সত্বেও এইসব ধর্মমতের মধ্যে মৌলিক ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে এমন কিছু মিল ছিল যার ফলে এইসব ধর্মমতগুলিকে হিন্দু নামে পরিচিত হতে কোন অসুবিধা দেখা দেয়নি।

ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী তুর্কীদের প্রথম ভারতে আগমন ঘটে ১০০১ খ্রীষ্টাব্দে। তারা এসেছিল আক্রমণকারী রূপে। এই সময়ে হিন্দু ধর্ম তার আভ্যন্তরীন কারনে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এর মধ্যে দেখা দিয়েছিল অবক্ষয়ের সুস্পষ্ট চিহ্ন। উপরন্তু সেই সময়ে ভারত হয়ে পড়েছিল অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজ্যে বিভক্ত এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ও হয়েপড়েছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। যার ফলে বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ভারত হারিয়েছিল।

এই অবস্থায় ভারতে বারে বারে মুসলমান আক্রমণ সংঘটিত হয় এবং এই মুসলিম শক্তি প্রথমে সিন্ধু প্রদেশে, পরে লাহোরে

এবং শেষ পর্যন্ত ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে সুলতানসাহী প্রতিষ্ঠা করে। বহিরাগত মুসলমানদের ভিন্ন ভিন্ন বংশ ও গোষ্ঠির সুলতানদের উত্থান-পতনের পর অবশেষে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের সুরুর দিকে সম্রাট বাবর দিল্লীকে কেন্দ্র করে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রতিষ্ঠা করেন মোগল সাম্রাজ্য। শেষ মোগল সম্রাট ঔরংজেবের মৃত্যু হয় ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে। ইতিমধ্যে ভারতে পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ, ডাচ, প্রভৃতি ইউরোপীয় শক্তির আবির্ভাব ঘটে। ঔরংজেবের মৃত্যুর পর ভারতে মুসলমান শাসন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। সেই অবস্থায় ইংরেজ বনিক শক্তি ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে জয় লাভ করে ভারতে ইংরেজ শাসনের সুত্রপাত ঘটায়।

প্রথম দিকে ভারতে মুসলিম আক্রমণের লক্ষ্য ছিল লুঠতরাজ, পরে তারা এদেশে রাজ্য স্থাপন ও স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করে। প্রথম দিকে কেবলমাত্র মুসলিম সেনারা এদেশে এলেও পরে স্থায়ী ভাবে বসবাস করার উদ্দেশ্যে বহু সাধারণ মুসলমান—মৌলবী-মোল্লা, শিল্পী-কারিগর, ব্যবসায়ী, সঙ্গীতকার, সাহিত্যিক প্রভৃতি এদেশে আসে।

প্রথম দিকে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় বিজিত ও বিজেতা শক্তি হিসাবে একে অপরের প্রতি পোষণ করত বৈরী মনোভাব। কিন্তু কয়েক শতাব্দী পরে ধীরে ধীরে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এই বোধ জাগ্রত হয় যে উভয় সম্প্রদায়কেই এই ভারত ভূমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হবে,—এই কারনে প্রয়োজন বৈরীতার অবসান, সহাবস্থানের মনোভাব ও একের অপরের প্রতি সহনশীলতা।

এই বাস্তব বোধ ও কয়েক শতাব্দী পাশাপাশি বসবাস করার ফলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়ে উঠতে থাকে

পারস্পরিক বোঝাপড়া ও উভয় সম্প্রদায়ের ভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি ও রীতিনীতির ক্ষেত্রে আদান-প্রদান ও একটা সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়া।

হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা ঃ

চতুর্দশ শতাব্দীতে ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দেয় এক বিশেষ ধরনের ধর্মান্দোলন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়ে ওঠা এই আন্দোলনের মূল চরিত্র ছিল ভক্তিবাদী। অনুষ্ঠান-সর্বস্ব শাস্ত্রীয় হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের সুক্ষ্ম পণ্ডিতিয়ানার বিরুদ্ধে ভক্তিবাদের প্রবক্তারা বলেন যে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে যে কোন মানুষের পক্ষেই ভক্তির মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর প্রাপ্তি সম্ভব। ভক্তিবাদীরা জাতিভেদ প্রথা, মৌলবী ও পুরোহিতদের আধিপত্য, ধর্মীয় গোঁড়ামী, নিজের ধর্মকে একমাত্র সঠিক ও অন্য ধর্ম ভুল মনে করার মত সঙ্কীর্ণ চিন্তা প্রভৃতির বিরুদ্ধে জোরাল প্রতিবাদ তুলে ধরেন।

মহান ভক্তিবাদী ধর্মগুরু কবীর (১৩৮০—১৪১৪) ছিলেন মুসলমান তাঁতি বা জোলা। আরবী ভাষার পরিবর্তে তিনি তার ভজনগুলি রচনা করেছিলেন এদেশে লোক চলতি ব্রজবুলি ভাষায় (হিন্দির অপভ্রংশ)। আজও কবীরের গান উত্তর ভারতে লোকগীতি হিসাবে প্রচলিত আছে। কবীর প্রচার করেন যে ঈশ্বর রামও নন আল্লাহ নন। তিনি আছেন প্রতিটি মানুষের অন্তরে, তিনি প্রেমময়। বিধর্মীদের শত্রুতা তিনি চান না, চান মানুষে মানুষে মৈত্রী।

পঞ্চদশ শতকে মহারাষ্ট্রে ভক্তিবাদী গুরু হিন্দু দর্জির ছেলে নামদেব দক্ষিণ ভারতে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। ষোড়শ শতকের সূচনায় সৎগ্রন্থ (সঠিক পথ)

আন্দোলন গুজরাট, সিন্ধুপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে ছড়িয়ে পড়ে। এঁরা প্রচার করেন যে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষই সমান। পরিশ্রম ও সততাই মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।

ইতিমধ্যে পাঞ্জাবে গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৯) প্রতিষ্ঠা করলেন শিখ (শিষ্য) ধর্ম। নানক ছিলেন লাহোরের একজন হিন্দু বনিক। জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি সকলের একসঙ্গে বসে পংক্তি ভোজন (গুরুকা লঙ্গর) চালু করলেন এবং দেশবাসীর সেবাকে প্রধান আদর্শ হিসাবে তুলে ধরলেন। মুসলমান সুফি ধর্মমত থেকেও শিখ ধর্ম অনেক কিছু গ্রহণ করে।

এদিকে বাংলাদেশে আবির্ভাব ঘটল শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৪)। তিনি প্রচার করলেন 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। জাতিভেদ প্রথা, ছুৎমার্গ, হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ ইত্যাদি সব সংকীর্ণতা ঘুঁচিয়ে দিয়ে তিনি সারা দেশে এক ভাবের প্লাবন এনেছিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁর শিষ্যদের মধ্যে মুচি, মেথর, মুসলমান নির্বিশেষে সকলকেই স্থান দিলেন। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন বর্ণাশ্রমে বিভক্ত ও ছুৎমার্গে কলুষিত মধ্যযুগীয় হিন্দু সমাজে চৈতন্যদেবের মহান সর্বধর্ম সমন্বয়, মানুষে মানুষে সমতার বানী ও মানবতার জয়গান যে কত বড় বিপ্লবী পদক্ষেপ ছিল তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয় এবং প্রচলিত কুসংস্কার ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থান্বেষী সমাজপতিদের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহাত্মক পদক্ষেপের কারনেই শোনা যায় যে শেষ পর্যন্ত তাঁকে চক্রান্তকারীদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

সে যুগে মুসলমান সমাজে বিশেষ করে সুফী সম্প্রদায় এই ধরনের ধর্মীয় সংস্কারমূলক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। সুফী সম্প্রদায় ধর্ম সম্পর্কে কোরাণের পণ্ডিতি ব্যাখ্যার চেয়ে প্রাধান্য দিত তাদের সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মগুরুর প্রচারিত সহজ-সরল সাধারণ মানুষের পক্ষে বোধগম্য ধর্ম মতকেই। এইসব ধর্মমত ছিল হিন্দু

ধর্মের সঙ্গে মিলেমিশে চলার পক্ষে। সুফী ধর্মগুরু নিজামুদ্দিন আউলিয়া, করিমুদ্দিন জাকার প্রমুখেরা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন এবং তাঁরা বিশেষ করে হিন্দুধর্মের প্রতি সহনশীলতার আবেদন জানাতেন। সুফী মতবাদ করিমুদ্দিন হিন্দিতে অনুবাদ করেন। এদের কোন কোন গোষ্ঠি উদার ও ভক্তিবাদী বৈষ্ণব ধর্মের অনেক কিছুই গ্রহণ করেন। আজও পশ্চিম বাংলার বহু অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা মুসলমান 'আউল' ও হিন্দু 'বাউল' কার্যতঃ একই ধর্মীয় ধ্যান-ধারনার অনুসারী।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বিশেষ করে গুজরাটে মুসলমান ধর্মের সংস্কার সাধনে বদ্ধপরিকর মাহ্‌দি সম্প্রদারে অভ্যুদয় হয়। এই মাহ্‌দি সাম্প্রদায় কোরাণের শিক্ষা অনুসারে মোল্লাতন্ত্র ও আমীর-ওমরাহদের ভোগ-বিলাসিতা এবং সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে তাদের আর্থিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। আর্থিক সাম্য ও সহজ-সরল জীবন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তারা ব্যাপক সাফল্যও অর্জন করে। রাজপুতনায় এই সময়ে ভক্ত 'দাদু'র অভ্যুদয় হয়। তিনি ব্যাপকভাবে মানবপ্রেমের আদর্শ প্রচার করেন।

হিন্দু ও মুসলমান ঐক্য ও গোড়ামীমুক্ত ধর্ম সৃষ্টির চিন্তা— যা সেযুগের বৈশিষ্ট হিসাবে দেখা দিয়েছিল তা অত্যন্ত জোরাল ভাবে প্রতিফলিত হয় সম্রাট আকবরের ধর্ম-সমন্বয় সৃষ্টির আন্তরিক প্রয়াসের মধ্যে।

সুবিশাল ও বৈচিত্রময় ভারতে সম্প্রসারিত মোগল সাম্রাজ্যের অধিশ্বর সম্রাট আকবর তাঁর তীক্ষ্ণ ও উদার বুদ্ধি নিয়ে বুঝেছিলেন যে দেশটা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই এবং এই দুই বিশাল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের উপরেই দেশের সুশাসন, শান্তি-শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। এই কারনে তাঁর পূর্বসূরী মুসলমান

সম্রাটেরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে যেসব বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে-ছিলেন তা তিনি প্রত্যাহার করেন।

১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিন্দু তীর্থ যাত্রীদের প্রদেয় কর এবং জিজিয়া কর বাতিল করে দেন। তিনি হিন্দুপত্নি গ্রহণ করেন এবং রাজপ্রাসাদে তাদের যথাবিহিত দেবদেবীর পূজা করার অনুমতি দেন। শাসন ক্ষেত্রের উচ্চপদে, দরবারে এবং সেনাবাহিনীর উচ্চপদে তিনি যোগ্যতা সম্পন্ন হিন্দুদের নিয়োগ করেন।

১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ফতেপুরে তিনি সকল ধর্ম বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি বিশাল সভাগৃহ নির্মান করেন এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশিষ্ট ধর্মীয় পণ্ডিতদের আলোচনার জন্য আহ্বান করেন। হিন্দু, পারসী, জৈন, খ্রিশ্চিয়ান প্রভৃতি ধর্মের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আকবর বিস্তারিত ভাবে ধর্মালোচনা করেন। আবুল ফজল এবং তার ভাই বিশিষ্ট কবি ফৈজী ছিলেন আকবরের একান্ত সুহৃদ ও উপদেষ্টা এঁরা উভয়েই ছিলেন মাহ্‌দি সম্প্রদায়ভুক্ত। বাল্য-কালে গোঁড়া মুসলিমদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য এদের পরিবারকে দীর্ঘকাল পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল। এদের চিন্তাধারার দ্বারা আকবর বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। আকবর বিশ্বাস করতেন যে সকল ধর্মের লক্ষ্যই হ'লো ঈশ্বর-সন্ধান এবং সকল ধর্মের উদ্দেশ্যই মহৎ।

শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মের সার সংকলন করে আকবর দীন-ই-ইলাহি নামে এক নতুন ধর্মের প্রবর্তন করেন। এই ধর্ম ছিল উদারনৈতিক এবং গোঁড়ামী মুক্ত। তিনি চেয়েছিলেন যে এই ধর্ম প্রচার করে তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মকেই নানাবিধ কুসংস্কার থেকে মুক্ত করবেন। মোল্লাতন্ত্রের গোঁড়ামী থেকে ইসলাম ধর্মকে মুক্তকরার উদ্দেশ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে সম্রাটই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি এবং ধর্মবিষয়ে তার মতামতই চূড়ান্ত।

ধর্ম বিষয়ে আকবরের এইসব কায়েমী স্বার্থ বিরোধী কাজের ফলে গোঁড়া শেখরা ভীষণ চটে যায় এবং আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করে। আকবর দৃঢ়হস্তে এইসব বিদ্রোহকে দমন করেন এবং তাঁর নিজস্ব ধর্মমতে অটল থাকেন।

এই যুগের ধর্মান্দোলন এবং হিন্দু মুসলমান চিন্তাধারার সমন্বয় সাধনের আগ্রহ শিল্প-সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। ফতেপুর সিক্রির স্থাপত্য-শৈলীতে হিন্দু সাংস্কৃতিক ধারার চিহ্ন সুস্পষ্ট। ফুলের মালার ছাঁদে অলঙ্করণ শৈলী পশুপাখির মূর্তি শোভিত ব্যাস রিলিফ প্রভৃতি হিন্দু শিল্পকলার নিদর্শন।

কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রেও হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। মুসলমান কবিদের রচনায় নানা হিন্দু দেব-দেবীর উল্লেখ ও পৌরানিক কাহিনীর অবতারণা দেখা দিতে থাকে। ফৌজী রচনা করেছিলেন 'নল-দময়ন্তী' কাব্য।

ধর্ম সম্পর্কে ভক্তিবাদী উদারনৈতিক চিন্তা জোরাল ভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায় জনপ্রিয় হিন্দী কবি তুলসীদাস, রাজ-পুতনার অন্ধগায়ক সুরদাস, সারা ভারতে পরিচিত ভক্তিগীতি রচয়িতা মীরাবাঈ, মহারাষ্ট্রের এক নাথ, আসামের শঙ্কর দেব ও বাংলার বৈষ্ণব কবিদের অসংখ্য শক্তিশালী ও কালজয়ী রচনায়।

সে যুগে ধর্ম-সংস্কারের ও হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের যে ব্যাপক ও শক্তিশালী উদ্যম দেখা দেয় তা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে যায়। সম্ভবত তখনকার সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক পরিবেশে এবং আওরঙ্গজেবের মত ধর্ম-বিষয়ে গোঁড়া রাষ্ট্র-নায়কদের স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা উদারনৈতিক ধর্মীয় চিন্তাধারার বিকাশের পথে অনুকূল ছিল না।

ব্রিটিশ আমলে ধর্মীয়-রাজনৈতিক বিরোধের বিকাশ ঃ

ভারতবর্ষে এই বাংলাদেশেই প্রথম ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইংরেজদের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুক্তিবাদী চিন্তাধারা ও শিল্প-সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীতে এক নব জাগরণের উন্মেষে ঘটে। এই নব জাগরণের পথিকৃত ছিলেন রাজা রামমোহন রায়।

রামমোহন প্রসঙ্গে জহরলাল নেহেরু লিখেছেন "সংস্কৃত, পারসী ও আরবী ভাষায় বুৎপত্তিসম্পন্ন এই মনীষীর উদ্ভব হয়েছিল সেযুগে প্রভাব বিস্তারকারী হিন্দু-মুসলীম সংস্কৃতির মধ্যে থেকে।" তিনি পাটনায় মৌলুবীদের তত্ত্বাবধানে থেকে আরবী, ফার্সী, উর্দু ও ইসলাম ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে উদারনৈতিক সুফী মতবাদ ও ইসলামের একেশ্বরবাদী চিন্তার দ্বারা তিনি গভীর ভাবে প্রভাবিত হন। পরে হিন্দুধর্মের পীঠস্থান কাশীতে থেকে তিনি সংস্কৃত ও হিন্দু শাস্ত্র বেদ-উপনিষদ অধ্যয়ন করেন। এইভাবে উভয় ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞানার্জন করে তিনি ধর্মসংস্কারে ব্রতী হন।

হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্মের মূলতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এক নতুন উদারনৈতিক ধর্মচর্চার কেন্দ্র হিসাবে তিনি প্রথমে প্রতিষ্ঠা করেন "আত্মীয় সভা" ও পরে "ব্রাহ্ম সভা"। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই ধর্মসভায় গোঁড়ামী ও আচার-বিচার মুক্ত সকল ধর্মীয় মানুষের প্রবেশাধীকার ছিল। রামমোহন প্রতিষ্ঠিত উপাষণা গৃহের নিয়মাবলীতে লিখিত ছিল যে এই উপাসণাগৃহে কোন ধরনের মূর্তি, প্রতিক বা ছবির ব্যবহার চলবে না এবং নৈবেদ্য .উৎসর্গ বা বলিদান ধরনের কোন অনুষ্ঠান করাও চলবে না। যে কোন ধর্ম-বিশ্বাসী মানুষ এই উপাষণালয়ে উপাষণা করতে পারবে। সেইসঙ্গে আরও লিখিত হয় যে অপর কোন ধর্মমত বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা এখানে নিষিদ্ধ।

এইভাবে রামমোহন হিন্দু মুসলমান বা অন্য যে কোন ধর্মাবলম্বী মানুষ অপরের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত না দিয়ে একত্রিত হয়ে ধর্মানুশীলন করতে পারে—এমন একটি মঞ্চ সৃষ্টিতে প্রয়াসী হন। যদিও পরবর্তীকালে ধর্মসভা রূপান্তরীত হয় ব্রাহ্ম সমাজে এবং সকল ধর্ম সমন্বয়ের কেন্দ্র হিসাবে তা না থেকে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত চিন্তাধারা নিজেই পরিণত হয় হিন্দু ধর্মেরই একটি নতুন শাখা হিসাবে ব্রাহ্ম ধর্মে।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে আধুনিক চিন্তাধারার আলোকে সুপ্রাচীন ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের রামমোহন রায় কৃত এই চেষ্টার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর উদীয়মান নবীন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিন্তাচেতনার ক্ষেত্রে ধর্মীয় রক্ষনশীলতা দূর করে এক উদার ও মুক্ত চিন্তার উন্মেষ ঘটিয়েছিল। ব্রাহ্ম সমাজের ছত্রছায়ায় অক্ষয় কুমার দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, হরিশ মুখার্জী, কেশব সেন, জগদীশ চন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, বিপিন পাল, আনন্দমোহন বসু ও সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত মহান ও সত্যিকারের বড় মাপের অসংখ্য মানুষ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু রামমোহনের ধর্মান্দোলন স্পষ্টতই হিন্দু ধর্মেরই একটি সংস্কৃত শাখা হিসাবে পরিগণিত হওয়ায় তা মুসলমানদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়নি এবং সেই হিসাবে তাঁর হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা ব্যর্থই হয়েছে বলা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রামকৃষ্ণদেব কৃত ধর্ম সংস্কারান্দোলনও একইভাবে হিন্দ ধর্মেরই অপর একটি শাখায় পরিণত হয়। শ্রীচৈতন্য ও ভক্তিবাদী সাধকের চিন্তাধারা অনুসরণ করে রামকৃষ্ণ দেবও এক অত্যন্ত উদার ধর্মমত প্রচার করেন যার সার কথা হ'ল "যত মত তত পথ" অর্থাৎ সব ধর্মমতই সমান শ্রদ্ধেয়। রামকৃষ্ণদেব ইসলাম ধর্মের সত্যানুসন্ধানের জন্য এক সময়ে মসজিদে থেকেও নিয়মিত নমাজ প্রভৃতি অভ্যাস করেন। রামকৃষ্ণ অনুসারীরা

রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র বেলুড় মঠের স্থাপত্যে হিন্দু ইসলাম ও খ্রীশ্চান প্রতীককে সমন্বিতও করেন। কিন্তু ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে তা হিন্দু ধর্মেরই রকমফের হিসাবে প্রতিভাত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর সূত্রপাতে ভারতীয় চিন্তার ক্ষেত্র প্রধানত দখল করে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন। এই জাতীয়তাবাদের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা যা বস্তুতই হিন্দুদের পক্ষে গর্বের সামগ্রী তা বলিষ্ঠভাবে এসে উপস্থিত হয়। জাতীয়তাবাদী সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের আবেগ উদ্রেক-কারী রচনাবলীর মধ্যে দেশমাতৃকার কল্পনা গীতার ন্যায়-যুদ্ধ ও নিষ্কাম-কর্মযোগের আদর্শকে সামনে রেখে দেশপ্রেমিক কর্মীদের সংস্থা হিসাবে সন্তান-দলের চিন্তা, বিবেকানন্দের বেদান্ত-দর্শন-ভিত্তিক অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টিকারী জাতীয়তাবাদী আহ্বান, গুজরাটের দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত দেশপ্রেমিক সংস্থা আর্য-সমাজের আদর্শ ও কর্মধারা। লোকমান্য তিলকের উদ্যোগে দেশপ্রেমের জাগরণের উদ্দেশ্যে গণেশ-চতুর্থী পূজা, শিবাজী উৎসব এবং বাংলাদেশে উদীয়মান বিপ্লবীদের পক্ষে আনন্দমঠ, গীতার আদর্শকে অনুসরণ করে মা-কালীর নামে দেশের ও জাতির জন্য আত্মোৎসর্গের শপথ গ্রহণ এবং বিংশ শতাব্দীর সুরুতে যে সব অসংখ্য দেশাত্মবোধক সাহিত্য, সঙ্গীত, কবিতা প্রকাশিত হয় তার মধ্যে হিন্দু ধর্মের প্রভাব ও প্রাচীন হিন্দু আদর্শগুলিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার আগ্রহ খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

স্বভাবতই এই হিন্দু জাতীয়তাবাদের উন্মেষ মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মানুভূতির পক্ষে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। তারা এই ধরনের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত হবার পরিবর্তে কিছুটা নিরুৎসাহিতই হয় এবং রক্ষনশীল মুসলীম নেতারা মুসলমানদের পৃথক চিন্তা ও পৃথক পথের অনুসন্ধানে ব্যপৃত হয়।

হিন্দু ও মুসলমান—এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির এ সুযোগ ইংরেজ রাজনীতিবিদরা ভালভাবেই কাজে লাগায়। আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ থিয়োডর বেক তার ধারাবাহিক রচনার মধ্যে দিয়ে মুসলিম চিন্তা-চেতনায় এই ধারনা সাফল্যের সঙ্গেই প্রথিত করে দেন যে হিন্দু ও মুসলমান দু'টি পৃথক জাতি, এদের শুধু ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারাই ভিন্ন নয় এদের জাতীয় স্বার্থও ভিন্ন এবং তিনি এই আশঙ্কাও ছড়িয়ে দেন যে স্বাধীনতার নামে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা হ'লে তা মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে হবে ক্ষতির কারণ।

এই পরোচনার ফলে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ হিসাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯০৬ সালে মুসলীম লীগ গঠিত হয় এবং হিন্দু ও মুসলমান রাজনৈতিক বিরোধের বীজ রোপীত হয়।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশের প্রথম যুগে হিন্দু ধর্মীয় দার্শনিক ভাবনা সামনে এসে পড়লেও প্রকৃতপক্ষে পূর্বোল্লিখিত জাতীয়তাবাদী নেতারা সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্ন ছিলেন না, তাঁরা প্রাচীন ভারতীয় আদর্শগুলিকে জনজাগরণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন মাত্র। তিলক, লাজপত রায়, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ছাড়াও জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাভাই নৌরজী, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, বম্বের ফিরোজ শা মেহতা, কাশীনাথ তৈলঙ্গ, বদ্রুদ্দীন তায়াবজী প্রমুখের মত জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা নেতৃবৃন্দের বৃহত্তম অংশই ছিলেন ধর্ম-নিরপেক্ষ (সেকুলার) মনোভাব সম্পন্ন। ধর্মকে রাজনীতি থেকে এরা যেমন দূরে রাখতে প্রয়াসী ছিলেন তেমনই হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সৌহার্দ্য গড়ে তোলার জন্য এদের সর্বদাই সচেতন প্রয়াস ছিল। প্রভাবশালী মুসলিন প্রতিনিধিরা যেমন জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ

গ্রহণ করেছিলেন তেমনই কংগ্রেসের সর্বোচ্চ সভাপতির আসনও তারা অলঙ্কৃত করেছেন। এই হিসাবে জাতীয় কংগ্রেস সুরু থেকেই হিন্দু, মুসলমান, পারসী, খ্রীশ্চান, শিখ প্রভৃতি সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অর্থাৎ ভারতীয় মাত্রেরই স্বার্থের জাতীয়তাবাদী সংস্থা হিসাবে গড়ে ওঠে ও কাজ করে।

মুসলিম লীগ গঠিত হবার পরে মুসলিম সম্প্রদায়কে রাজনীতিগত ভাবে লীগের প্রভাবাধীন করার উদ্দেশ্যে ১৯০৯ সালে মর্লি-মিন্টো প্রস্তাবে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করার কথা বলা হয় এবং তাকে আইনে পরিণত করা হয়।

এই সময়ে প্রগতিশীল মুসলিম বুদ্ধিজীবিরা মুসলমান সম্প্রদায়কে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা এবং দেশের বৃহত্তম জাতীয়তাবাদী সংস্থা জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য রাজনৈতিক প্রচারান্দোলন সুরু করেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে অগ্রগণ্য। তিনি ইংরাজীতে 'কমরেড' ও উর্দুতে আল-হিলাল নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং এই দুটি পত্রিকাই মুসলমান সমাজে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। মহম্মদ আলি জিন্নাও এই সময়ে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। মুসলীম লীগকে আন্দোলনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সমীপবর্তী করার দিক থেকে জিন্নার ভূমিকাও ছিল প্রশংসনীয়। এই প্রচেষ্টার ফলে এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আগ্রহে ১৯১৬ সালে লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ লক্ষ্মৌতে মিলিত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ ভাবে চলার এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ইতিহাসে পরিচিত এই লক্ষ্মৌ-চুক্তি বা লীগ কংগ্রেস চুক্তির ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক সৌহার্দের মনোভাব গড়ে ওঠে। ১৯১৯ সালে রাওলাট এ্যক্টের বিরুদ্ধে গান্ধীজী যে প্রথম দেশব্যাপী হরতাল পালনের ডাক দেন সে আন্দোলন হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের যুক্ত উদ্যমে বিরাট সাফল্য

অর্জন করে। ১৯২১ সালে যে অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয় তার সঙ্গে যুক্ত করা হয় খিলাফত আন্দোলনকে এবং এই উভয় আন্দোলনেই হিন্দু-মুসলমান যুক্ত কর্মসূচী অনুসৃত হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই পর্বটি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে আছে।

কিন্তু হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের এই চমৎকার নজীরগুলি সৃষ্টি হবার অল্পকাল পরেই ২৪-২৫ সালে ভারতের ব্যাপক অঞ্চলে দেখা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই দাঙ্গার পিছনে বড় কোন কারন ছিল না। কোথাও মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসবে গোহত্যাকে কেন্দ্র করে, কোথাও মসজিদের সামনে বাজনা বাজানকে কেন্দ্র করে, কোথাও বা একই দিনে দুই সম্প্রদায়ের ধর্মীয় শোভাযাত্রায় সংঘর্ষ দেখা দেয় ব্যাপক দাঙ্গার আকারে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯২৪-২৫ সালের এ দাঙ্গার জন্য তাদের অতিমাত্রায় ধর্মপ্রবণতা ও রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে মিশ্রিত করার ঘটনাকে দায়ী করে জহরলাল নেহেরু লিখেন :

"১৯২১ সালে খিলাফত আন্দোলনকে প্রাধান্য দেবার ফলে বহুসংখ্যক মৌলবী ও মুসলমান ধর্ম-প্রচারক রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁহারা আন্দোলনের উপরে ধর্মের রঙ চড়াইতেন যাহাতে মুসলমান জনতা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।... আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের মনের ধর্মপ্রবণতা ছিল ইহার সহায়ক, গান্ধীজীর তদ্রুপ...। গান্ধীজী সর্বদাই আন্দোলনের ধর্ম ও আধ্যাত্মিক ভঙ্গীর উপরে জোর দিতেন। তাঁহার অবশ্য ধর্মের গোঁড়ামী ছিল না। তথাপি সমগ্র আন্দোলনের মধ্যে এক ধর্মের জাগরণ অনুভূত হইল এবং জনসাধারণের মধ্যেও ধর্মের আকাঙ্খা জাগাই'ল।... আমার পিতা, দেশবন্ধু দাস এবং অন্যান্য অনেকে সাধারণ ভাবে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁহারা রাজনৈতিক সমস্যাগুলিকে

রাজনৈতিক ভিত্তিতেই বিচার করিতেন। তাহারা জনসভায় ধর্মের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন না।....

"অধিকাংশ মৌলবী, মৌলানা, স্বামীজীরা জনসভায় যেভাবে ভাষণ দিতেন তাহা আমার কাছে ক্লেশকর মনে হইত। তাহারা ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতির সহিত ধর্মের গুড়ন-বাড়ন দিয়া সরলভাবে চিন্তা করিবার পথ রুদ্ধ করিতেন। আমার নিকট ইহা অন্যায় বলিয়া বোধ হইত। গান্ধীজীর কতকগুলি উক্তিও আমার কানে বাজিত। তিনি প্রথমেই রামরাজ্য ও সত্যযুগ ফিরাইয়া আনার উল্লেখ করিতেন। কিন্তু ইহা নিবারণ করিবার শক্তি আমার ছিল না। (আত্মজীবনী পৃঃ ৭৭-৭৮)

আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা লেখক লিখেছেন, তা হ'লো : "আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের অস্পষ্টতাই সাম্প্রদায়িকতা প্রচারে সহায়তা করিয়াছিল।" (ঐ পৃঃ ১৪৯)

গান্ধীজী ও কিছু কিছু নেতা মানুষের মধ্যে উন্নততর ভাব-ধারার বিকাশ ঘটানোর জন্যে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতাকে রাজনীতির মধ্যে টেনে আনতেন। হিন্দু ও মুসলমান ঈশ্বর ও আল্লা অর্থাৎ ভিন্ন নামে ভগবানকে চিহ্নিত করলেও আসলে উভয়েরই ভগবান এক—এই ভাবধারার মধ্যে বিভেদ দূর করার উদ্দেশ্যে গান্ধীজী জনসভায় রামধুন গাইতেন। কিন্তু এই ধার্মিকতার ফল সাম্প্র-দায়িকতা দূর করতে কতটুকু সাহায্য করেছিল তা বলা মুশকিল। মনে হয় গান্ধীজী ঈশ্বর ও আল্লাকে যতই এক করে দেখাবার চেষ্টাই করুন না কেন তাঁর ধর্মীয় আচার-আচরনের মধ্যে দিয়ে তিনি একজন হিন্দু ধর্মীয় নেতা হিসাবেই মুসলমানদের চোখে প্রতিভাত হয়েছেন এবং মানষিক ভাবে তারা গান্ধীজীর কাছ থেকে দূরেই সরে গেছে।

হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক স্বার্থ ও রাজনৈতিক লক্ষ্যকে সুস্পষ্ট করে তোলে ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত পাকিস্তানের দাবি। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও শাসক শক্তি ক্রিপস মিশনের প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে জানিয়ে দিল যে তারা পাকিস্তান গঠনের দাবি গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

এরপরেও আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের মুক্তির দাবিতে কলকাতায় পালিত রশিদ আলি দিবসে এবং বম্বে ও করাচীতে সংঘটিত ঐতিহাসিক নৌ-বিদ্রোহে একই সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়েছে। আর ঠিক এই কারনেই হিন্দু ও মুসলমান জনতাকে চূড়ান্তভাবে বিভক্ত করে পাকিস্তানের দাবিকে মেনে নিতে বাধ্য করার জন্য একদিকে যখন মুসলিম লীগ ডাক দিল 'ডাইরেক্ট একশন' বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ঠিক সেই সুযোগেই 'হিন্দু মহাসভার' মত হিন্দু সাম্প্রদায়িক দল ঝাঁপিয়ে পড়ল রাস্তায় নেমে মুসলীম লীগের ডাকের বিরোধিতায়। যার অবধারিত ফল হিসাবে দেখা দিল ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বিভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ফলে ভারতকে বিভক্ত করার পথে আর কোন বাধাই রইল না।

ভারত বিভাগের ফলে তারই রেশ হিসাবে স্বাধীনতা লাভের পর মুহুর্তেই কিছু কিছু দাঙ্গা-হাঙ্গামা চললেও পরবর্তীকালে তা স্তিমিত হয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু তা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। স্বাধীনতা পরবর্তী গত প্রায় চল্লিশ বছরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতে দেখা গেছে এবং একই ভাবে ভবিষ্যতেও এর সম্ভাবনা রয়ে গেছে।

ইদানিংকালের এইসব দাঙ্গাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে এর পিছনে নিম্নলিখিত কারণগুলি দেখা যায় :

(ক) ধর্মের মূল শিক্ষা আত্মিক ও নৈতিক জীবনের উন্নতি সাধন, মানবপ্রেম বৃদ্ধি প্রভৃতির চেয়ে সাধারণ মানুষ বাহ্যিক

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে যেমন বড় বলে মনে করে তেমনই তাঁদের মনের মধ্যে রয়ে গেছে নানা কুসংস্কার ও ধর্ম বিষয়ে অতিমাত্রায় স্পর্শকাতরতা।

(খ) একদিকে যেমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে স্বার্থান্বেষী বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র নানা পথে প্রচুর অর্থ সাহায্য দিয়ে ভারতে মুসলিম রক্ষণশীল মৌলবী মোল্লাদের গোঁড়া, ইসলামি ভাবধারার ভিত্তিতে মুসলিম জনতাকে সংগঠিত করতে সাহায্য করছে তেমনই আবার রক্ষণশীল হিন্দুদের একটা অংশ নানাভাবে মৌলিবাদী চিন্তাধারা প্রসারে তৎপর হচ্ছে এবং এদেরও বিভিন্ন অনুষ্ঠান সংগঠিত করার পিছনে দেখা যাচ্ছে অর্থের প্রাচুর্য।

(গ) আমাদের ভোটের রাজনীতিতে ভোট পাওয়ায় উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতাদের দেখা যাচ্ছে প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে তাদের রাজনীতির মধ্যে টেনে আনতে এবং জনসাধারণের কুসংস্কার ও দুর্বলতাগুলিকে কাজে লাগাতে।

(ঘ) অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে যদি পুলিশ বাহিনী সাম্প্রদায়িক বিরোধের সুরুতেই সম্প্রদায় নিরপেক্ষভাবে দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে দৃঢ় হস্তে ব্যবস্থা গ্রহণ করে তবে দাঙ্গা বিস্তার লাভ করতে পারে না। কিন্তু পুলিশের পক্ষে ক্ষেত্র বিশেষে সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি সহানুভূতি বশতঃ নিস্ক্রীয় থাকার ঘটনা যথেষ্টই দেখা যায়। ফলে দাঙ্গা বিভৎস রূপ গ্রহণ করে।

দেশী-বিদেশী মৌলবাদীদের, রাজনৈতিক নেতাদের এবং পুলিশ বাহিনীর প্রশ্নে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত তা ভাবতে পারে একমাত্র সর্বোচ্চ পর্যায়ের জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব। কিন্তু সবকিছুর উপরে সাধারণ মানুষের ধর্ম সম্পর্কে যুক্তিহীন অন্ধ আচার-সর্বস্বতা, কুসংস্কার নিজ ধর্মের পবিত্রতা রক্ষায় অতি ‍ ায়

পর্শকাতরতা ইত্যাদি মনোভাবের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন করা যদি না যায় তবে সাম্প্রদায়িক বিরোধকে কখনই নির্মূল করা যাবে না।

ইউরোপের দেশগুলিতে অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগের অবসান ঘটিয়ে আধুনিক যুগের সৃষ্টির পথে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের আগে সেখানে ঘটেছিল চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে সুগভীর ও সুদূর প্রসারী বিপ্লব। প্রাচীন ধর্মীয় চিন্তা, কুসংস্কার—এসবের ক্ষেত্রে সারা ইউরোপ জুড়ে সংগঠিত করা হয়েছিল প্রচণ্ড বলশালী এক বা একাধিক আন্দোলন। সেযুগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জন্ম নিয়েছিলেন প্রচণ্ড বলশালী মনীষীরা যাঁরা অসীম সাহস নিয়ে পুরাতন সমস্ত চিন্তা-ভাবনাকে নির্মমভাবে টেনে এনে দাঁড় করিয়ে-ছিলেন সমালোচনা ও যুক্তি-বিচারের সামনে। যুক্তিবাদকে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সর্বোচ্চ দেবতার আসনে। এই যুক্তি-দেবতার বিচারে এতাবৎকালের ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ, ধর্মীয় বিশ্বাস প্রভৃতি যা কিছু সিদ্ধ প্রমাণিত হবে তাই শুধু গ্রহণীয় বাকী সব নির্দ্ধিধায় বর্জনীয়।

এই আন্দোলনের ফলে প্রাচীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস, পুরোহিততন্ত্রের আধিপত্য, ন্যায়-নীতি ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা প্রভৃতির ক্ষেত্রে দেখা দিল আমূল পরিবর্তন। সর্বোচ্চ স্থান পেল মানবতাবাদ। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, ইতিহাস, রাজ-নীতি, দর্শন প্রভৃতি সব কিছুকেই বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রয়োগে বিচার-বিবেচনা করার প্রবণতা দেয় তীব্রভাবে।

চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন, নতুন জ্ঞান-দীপ্তি এতাবৎকালের ধর্মের নামে যাবতীয় স্বৈরাচার, ধর্মযুদ্ধ সাম্প্র-দায়িক বিদ্বেষ এবং চিন্তার ক্ষেত্রে কূপমণ্ডূকতা নির্মূল করে সর্বক্ষেত্রে সমাজ অগ্রগতি, মানবিক অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করে দেয়। এরই ফলে সংগঠিত হয় শিল্প-বিপ্লব, সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বড় বড় পরিবর্তন।

ভারত স্বাধীন হয়েছে। আমাদের নিজেদের চেষ্টা ছাড়াই পেয়ে যাওয়া পশ্চিম থেকে আমদানি করা আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যাকে আমরা বৈষয়িক উন্নতির জন্য কাজে লাগাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে আমরা ভারতীয়রা এখন পড়ে আছি বহু পিছনে, সেই মধ্যযুগীয় চিন্তার দৈন্যের পর্বে। তাই সব কিছুই আমাদের চলছে গতানুগতিকভাবে ধীরে ধীরে। যতটুকু আমরা এগোচ্ছি তার চেয়ে দ্রুতগতিতে নানা জটিল সমস্যা আমাদের গ্রাস করছে।

আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরে পশ্চিমের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাব কিছুটা পড়লেও আমাদের পা যেন ডুবে আছে প্রাচীন ধ্যান-ধারণা, অভ্যাস-বিশ্বাসের নরম কাদায়।

এক বলশালী চিন্তার জাগরণ ছাড়া, যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ ও মানুষের সৃষ্টিশীল ক্ষমতায় গভীর বিশ্বাস আনয়ন করার জন্য এক বেগবান সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া আমরা দেশ, সমাজ ও প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে প্রার্থীত ফল লাভ করতে পারি না।

এই মানসিক পশ্চাদপদতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, বিরোধ ও সংঘর্ষের মূল। এই কারনে সামগ্রিক ভাবে আমাদের চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে সুগভীর পরিবর্তন ব্যতিরেকে সাম্প্রদায়িকতার মূলোৎপাটন করা অসম্ভব।

ভাষা-বিরোধ, প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ

প্রাচীনকাল থেকেই নৃতাত্বিক দিক থেকে ভারত একটি বহু জাতি-উপজাতি অধ্যুসিত দেশ। বিভিন্ন সময়ে বিদেশ থেকে বেশ কিছু জাতি-উপজাতি ভারতে প্রবেশ করে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। ভারত ভূখণ্ডের বিশলতা, বিভিন্ন অঞ্চলে আবহাওয়া ও ভূ-প্রকৃতিগত পার্থক্য ও ঐতিহাসিক কারনে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন গোষ্ঠির মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ভাষা, পোষাক পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি প্রভৃতি গড়ে ওঠে। শাসন-ব্যবস্থার দিক থেকেও সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন শাসক শক্তির অভ্যুদয় হয়।

মধ্যযুগে সম্রাট অশোক, মৌর্য্য ও গুপ্ত শাসকরা এবং মোগল সম্রাটরা ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে তাদের সাম্রাজ্যের অধীন করেন। কিন্তু এরফলে ঐ সাম্রাজ্যের অধীনে বসবাসকারী বিভিন্ন ভাষাভাষি মানুষের জাতিসত্বার দিক থেকে কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

ইংরেজ শাসকরাই প্রথম সমগ্র ভারত ভূ-খণ্ড জুড়ে এক সুসংবদ্ধ শাসন-ব্যবস্থা এবং তার প্রয়োজনেই উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলে সারা ভারতকে একটি রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলার মধ্যে আনয়ন করে। কিন্তু তা সত্বেও ভারত ইংরেজ শাসনের অধীনেই ছয় শতেরও বেশী স্বাধীন করদ রাজ্যে, যার মোট জনসংখ্যা ছিল সারা ভারতের জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, বিভক্ত থাকে এবং প্রত্যক্ষ বৃটিশ শাসনাধীন ভারতকে শাসন-শৃঙ্খলার প্রয়োজনে তারা কতকগুলি প্রাদেশিক রাজ্যে বিভক্ত করে।

উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালে ভারত যখন স্বাধীন হ'লো তখন প্রায় পাঁচশ' পঞ্চাশটি স্বাধীন করদ রাজ্য ভারতের সঙ্গে যোগ দিতে স্বীকৃত হয় (যদিও জম্মু-কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ, ময়ূরভঞ্জ ইত্যাদির মত কিছু বৃহৎ রাজ্যকে ভারতের অন্তর্ভূক্ত করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় এবং কিছুদিন পরে এরা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়) এবং বাকিগুলি হয় পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে এইসব ভূতপূর্ব রাজন্যবর্গ শাসিত রাজ্যগুলি কোনটি ভারতের কোন প্রাদেশিক রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হবে কোনটিরই বা থাকবে সম্পূর্ণ পৃথক অস্তিত্ব তা নির্ধারণ করাই ছিল ভারতের ঐক্যের দিক থেকে সর্ব-প্রধান সমস্যা।

এই সমস্যার একটা সাময়িক নিস্পত্তি হিসাবে ২১৬টি ক্ষুদ্র রাজ্যকে সংলগ্ন প্রদেশের অন্তর্ভূক্ত, ৭০টি বৃহৎ রাজ্যকে পৃথক রাজ্য এবং প্রায় ২৭০টি কেন্দ্রশাসিত রাজ্যে পরিণত করা হয়।

এর পরেই স্তুরু হয় সংবিধান রচনার কাজ। সংবিধান-সভার আলোচনায় ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের প্রশ্নটি নিয়ে তুমুল বিতর্ক দেখা দেয়। নীতিগতভাবে কংগ্রেস, সেই ১৯২৮ সালে 'নেহেরু সংবিধানেই' ভাষা-ভিত্তিক প্রদেশ গঠনেণ লক্ষ্য গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সদ্য-স্বাধীন ভারতে তৎকালীন রাষ্ট্র-ক্ষমতায় আসীন কংগ্রেস নেতৃত্ব ঠিক সেই সময় সময়ে প্রশাসনিক কারনে ব্রিটিশ আমলে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা প্রাদেশিক রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে কোন বড় রকমের পরিবর্তন ঘটান সুবিবেচনার কাজ হবে বলে মনে করেনি। ফলে ১৯৫০ সালে ঘোষিত ভারতীয় সংবিধানে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের নীতিটি অস্বীকৃত হয়।

ফলে, কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতের বিভিন্ন অংশে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবিতে আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে ১৯৫৬ সালে ১লা নভেম্বর লোকসভায় গৃহীত আইনের মাধ্যমে রাজ্যগুলির পুনর্গঠন করা হয় এবং

ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের নীতিটি স্বীকৃতি পায়। ভারতকে ১৪টি পূর্ণ রাজ্যে এবং ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়।

জাতি–সত্বাগত চেতনার বিকাশ ও আন্দোলন ঃ

ভারত প্রাচীনকাল থেকেই বহু জাতি-উপজাতিতে বিভক্ত হলেও জাতি-সত্বাগত চেতনা এবং অধিকারবোধ জন্ম নেয় আধুনিক যুগে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার সংস্পর্শে আসার পরে। আবার ভারতের ছোট বড় অসংখ্য জাতি উপজাতির মধ্যে জাতি সত্বার চেতনা একই সঙ্গে বর্দ্ধিত ও পরিণতি লাভ করেনি। বড় বড় কিছু জাতি, যাদের ভাষা সংস্কৃতি ও অর্থনীতি যথেষ্ট বিকশিত হয়, তাদের মধ্যে ব্রিটিশ আমলেই জাতি-সত্বাগত চেতনা পরিণতি লাভ করে। তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র ও পশ্চাদপদ উপজাতিগুলির মধ্যে জাতীয় চেতনা বিকশিত হতে থাকে ধীরে ধীরে। ফলে, ভাষা সংস্কৃতি ও অর্থনীতিগত ভাবে পিছিয়ে থাকা বহু জাতি উপ-জাতির মধ্যে এখনও জাতি-সত্বাগত চেতনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে ওঠেনি, তা নিজ নিজ ভাষা ও অর্থনীতিগত বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই বর্দ্ধিত হয়ে চলেছে।

ব্রিটিশ আমলে জাতিগত অধিকার প্রচেষ্টা করার প্রশ্নটি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি কারন তখন মূল ও একমাত্র লক্ষ্যই ছিল সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা অর্জন। ভারতের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন জাতির নিজ নিজ অধিকারের প্রশ্নটি ছিল তখন নিছক অবান্তর। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে মানুষ চরম দুঃখ দৈন্যকেও নিরুপায়ভাবে মেনে নিতে বাধ্য হ'তো।

স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে আশার সঞ্চার হয় সঙ্গে সঙ্গে অধিকার বোধও তীব্রতর হতে থাকে। শিক্ষার প্রসার ও অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জাতি উপজাতির মধ্যে জাতি-সত্বাগত চেতনা এবং আশাংআকাঙ্খা বৃদ্ধি

পায়, ফলে জাতিভিত্তিক রাজ্য গঠন ও স্বশাসন গড়ে তোলার দাবি দেখা দেয়।

১৯৫২ সালেই তেলেগু ভাষাভাষি জনসাধারণ অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের দাবি তুলে ধরে। ঐ বছরেই ডিসেম্বর মাসে জনৈক কংগ্রেস নেতা শ্রীরামালু অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের দাবিতে অনশন করে মৃত্যু বরণ করেন। ফলে আন্দোলন তীব্র ও হিংসাত্মক রূপ গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় সরকার অনতিবিলম্বেই অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

দ্বিভাষী (মারাঠি ও গুজরাটি) বোম্বাই রাজ্য পৃথকীকরনের দাবীতে '৫৭ সাল নাগাদ তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। ফলে ১৯৬০ সালে বোম্বাই রাজ্যকে ভেঙ্গে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্য গঠন করা হয়।

দ্বি-ভাষী (পাঞ্জাবী ও হিন্দি) পাঞ্জাব রাজ্যেও দীর্ঘদীন ধরে ভাষা ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের বা 'পাঞ্জাবী সুবা' গঠনের আন্দোলন চলে। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৬ সালে পাঞ্জাবকে ভেঙ্গে ভাষা ভিত্তিতে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্য গঠিত হয়।

আসামে নাগা, মিজো, লুসাই প্রভৃতি বিভিন্ন পার্বত্য উপজাতি জাতীয় স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে আন্দোলন সুরু করে। নাগা মিজোদের আন্দোলন সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের রূপ নেয় এবং এই সুযোগে স্বার্থান্বেষী বিদেশী শক্তি সব রকমের সাহায্য যুগিয়ে এই আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদের পথে নিয়ে যায়। বহু রক্তক্ষয় ও প্রাণহানীর পরে বিভিন্ন পার্বত্য উপজাতিদের জাতি সত্বাগত চেতনা ও স্বশাসনের আশা-আকাঙ্খার স্বীকৃতি হিসাবে নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, অরুণাচল, মনিপুর, মেঘালয় প্রভৃতি রাজ্য গঠন করা হয়।

আসাম আন্দোলন ঃ

আসাম থেকে পার্বত্য রাজ্যগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে আসামের আয়তন ছোট হয়ে যায়। উপরন্তু বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন সময়ে অর্থনৈতিক কারণে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশের নাগরিক আসামে এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করতে থাকে। সেই সঙ্গে পার্বত্য অঞ্চল হওয়ার ফলে এবং ভারতের সঙ্গে যানবাহনের যোগাযোগের অসুবিধা থাকার দরুন আসামের অর্থনৈতিক উন্নয়নও হয় তুলনামূলক ভাবে কম। এইসব কারনে আশির দশকের সুরু থেকে আসামের শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় অসমীয়া জাতির স্বার্থে বাংলাদেশ থেকে আসা 'বিদেশী' খেদা আন্দোলন সুরু করে। এই আন্দোলন ব্যাপকভাবে অসমীয়া জাতীয়তাবোধকে জাগিয়ে তোলে, এই জাতীয়তাবোধকে উস্কানী দিয়ে উগ্র প্রাদেশিকতার সৃষ্টি করা হয় এবং আসামে বহু বংশ পরম্পরায় বসবাসকারী বাঙালীদের বিরুদ্ধে ব্যপক পরিকল্পিত হামলা করা হয়।

এই পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায় যে এই আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতা-বাদের পথে ঠেলে নিয়ে যাবার জন্য, ভারতকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দুর্বল করে দিতে চায় যে সব সাম্রাজ্যবাদী ও স্বার্থান্বেসী শক্তি, তারা নানাভাবে এই আন্দোলনকে মদত দিয়ে চলেছে।

কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম থেকেই স্বীকার করে যে আন্দোলন-কারীদের কতকগুলি দাবির পিছনে অবস্থই ন্যায়-সঙ্গত কারণ আছে যার আলোচনার মধ্যে দিয়ে মীমাংসা করতে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদাই আগ্রহী কিন্তু উগ্র প্রাদেশিকতা প্রসূত এমন কিছু দাবিও তারা করছে যা ভারতের ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। ন্যায়-সঙ্গত দাবিগুলির মীমাংসার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বারে বারে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বৈঠক করে। কিন্তু উগ্রপন্থী নেতাদের অনমনীয়তার ফলে দীর্ঘকাল ধরে সেসব বৈঠক ব্যর্থ হয়।

পরিশেষে দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে কেন্দ্রীয় সরকারের তৎপরতায় এই আন্দোলনের একটা মোটামুটি সন্তোষজনক মীমাংসা সম্ভব হয়।

পাঞ্জাব আন্দোলন ঃ

ইতিমধ্যে ভারতের অপর প্রান্তে, পাকিস্তান সংলগ্ন পাঞ্জাবে শিখ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থে তাদের ধর্মীয় রাজনৈতিক পার্টি আকালীদলের নেতৃত্বে শিখদের জন্য কতকগুলি বিশেষ সুযোগ-সুবিধার দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন শুরু করা হয়। এই আন্দোলনের ক্ষেত্রে অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের চেয়ে প্রাধান্য লাভ করে শিখদের ধর্মীয় স্বার্থ। শিখ ধর্মগুরুরা আকালীদলের মধ্যে ও বাইরে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দখল করে ব্যাপকভাবে শিখ জনসাধারনের মধ্যে ধর্মীয় ভাবাবেগ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়।

এই আন্দোলনে উগ্র ধর্মান্ধতার সুযোগ খোলাখুলিভাবেই ভারতের ঐক্য ও সংহতির বিরুদ্ধে কাজে লাগায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। কেনাডা ও পাকিস্তান থেকে টাকা-পয়সা অস্ত্রশস্ত্র ও প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দিয়ে ধর্মান্ধ উগ্র শিখ যুবকদের পৃথক পাঞ্জাব বা খালিস্তানের দাবিতে সন্ত্রাসবাদের পথে ঠেলে দেওয়া হয়। শিখ গুরুদোয়ারা গুলিকে কেন্দ্র করে এক ব্যাপক সশস্ত্র তৎপরতা এই আন্দোলনকে গ্রাস করে।

আসামের মত পাঞ্জাবের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকার করে যে আকালীদল পরিচালিত আন্দোলনের দাবিগুলির মধ্যে অবশ্যই কিছু দাবির যুক্তিযুক্ততা অনস্বীকার্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদাই সেগুলির মীমাংসায় প্রস্তুত এবং সেই উদ্দেশ্যে বারে বারে আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকে বসে। কিন্তু এদের মধ্যেকার ধর্মান্ধ ও উগ্র বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অনিচ্ছার ফলে মীমাংসা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

সন্ত্রাসবাদ দমন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও ধর্মস্থানগুলিকে অস্ত্রশস্ত্র ও সন্ত্রাসবাদীদের কবলমুক্ত করার চেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত ভারতের মহীয়সী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে প্রাণ দিতে হয়।

এতদসত্বেও ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায় উগ্রপন্থীদের বিচ্ছিন্ন করে আকালীদলের শান্তি-কামী ও সত্যিকারের আর্থ-রাজনৈতিক সমস্যা মীমাংসায় আগ্রহী লাঙ্গোয়াল গোষ্ঠির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনা করে পাঞ্জাবে শান্তি শৃঙ্খলার পরিবেশ ফিরিয়ে এনে সেখানে আকালীদল পরিচালিত একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন।

পাঞ্জাবে রাতারাতি সব সমস্যা সমাধান করে সম্পুর্ণ শান্তি ফিরিয়ে আনা কোন মতেই সম্ভব ছিল না। ন্যায়-সঙ্গত দাবিগুলির পরিপুর্ণ মীমাংসা এখনও কিছু বাকি; সন্ত্রাসবাদীরা শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে চোরা-গোপ্তা এখানে সেখানে গুপ্ত হত্যা এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এটা খুবই পরিস্কার যে এক বছর আগেও বিচ্ছিন্নতাবাদের আতঙ্ক যা ভারতবর্ষকে এক অস্থিরতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল তা থেকে আমরা আজ মুক্ত হতে পেরেছি এবং এমন আশা করারও যথেষ্ট কারণ আছে যে অদূর ভবিষ্যতেই পাঞ্জাবের এখনও অমিমাংসীত প্রশ্নগুলির মীমাংসা হবে এবং সন্ত্রাসবাদও সম্পুর্ণ নির্মূল হবে।

গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলন ঃ

১৯৮৫ সালে পশ্চিম বাংলার উত্তরাঞ্চল দার্জিলিং জেলায় নেপালী ভাষাভাষী সংগঠন ভাষা পরিষদ নেপলী ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভূক্তির দাবি তুলে ধরে। এই দাবি নেপালী বিভিন্ন সংস্থা বহু আগে থাকতেই জানিয়ে আসছিল এবং অতীতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সকল রাজনৈতিক দলই সর্ব-সম্মতিক্রমে এই ভাষার দাবির প্রতি সমর্থনও জানিয়েছিল।

'৮৬ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে সুভাষ ঘিসিং পরিচালিত গোর্খা ন্যাশানাল লিবারেশন ফ্রন্ট গোর্খাদের অর্থাৎ ভারতে বসবাসকারী নেপালীদের জন্য পৃথক রাজ্য হিসাবে 'গোর্খাল্যাণ্ড' দাবি করে। মে মাসে এই দাবির সমর্থনে দার্জিলিং জেলায় বন্ধ ডাকা হয়। এই বন্ধ উপলক্ষে পুলিশের গুলিতে ১৪ জন নর-নারী ও শিশু কার্শিয়াং-এ প্রাণ হারায়। ফলে কয়েকদিন ধরে লাগাতার 'বন্ধ' পালিত হয়।

বামফ্রন্ট ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই আন্দোলনকে 'এন্টি-ন্যাশনাল' ও 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' ঘোষণা করে এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। লোকসভায় বামদলগুলির প্রতিনিধিরা দাবি করেন যে কেন্দ্রীয় সরকার এই আন্দোলনকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' ও 'এ্যান্টি-ন্যাশনাল' ঘোষণা করুক। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে এই ধরনের ঘোষণা করতে অস্বীকার করেন।

ইতিমধ্যে বাংলার প্রাক্তন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমানে পাঞ্জাবের রাজ্যপাল সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় কলকাতায় বলেন যে গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলনের দাবিগুলির মধ্যে কিছু কিছু দাবি ন্যায়-সঙ্গত সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে তা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। একই সময়ে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী নর বাহাদুর ভাণ্ডারী ভারতীয় নেপালীদের ন্যায়-সঙ্গত দাবিগুলি নিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানান।

বামফ্রন্ট সরকার দৃঢ়ভাবে এইসব বক্তব্যের এবং প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে এই আন্দোলনকে 'দেশদ্রোহী' ঘোষণা করার অস্বীকৃতির তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং আগষ্ট মাসে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সমেত সমস্ত দল এক সর্বদলীয় বৈঠকে এই আন্দোলনকে 'দেশদ্রোহী' ও

'বিচ্ছিন্নতাবাদী' ঘোষণা করে এর বিরুদ্ধে সম্মিলিত ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুলিশী-ব্যবস্থা ও সি. পি. আই (এম) কর্মীদের তৎপরতার কারণে জি-এন-এল-এফ ও সি. পি. আই (এম) কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে স্বরু করে।

ইতি মধ্যে সি. পি. আই (এম) নেতৃত্ব দাবি করে যে অবিলম্বে নেপালী ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তপশীলির অন্তর্ভূক্ত করা হোক এবং ভারতীয় সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দার্জিলিঙ অঞ্চলে নেপালীদের স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হোক। সি.পি. আই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব একটি বিবৃতিতে গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলনের বিরোধিতা করলেও আলোচনার মধ্যে দিয়ে মীমাংসার প্রস্তাব করেন।

সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলনকে 'দেশদ্রোহীতা' মূলক বা 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' ঘোষণা করার উপযুক্ত তিনি কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ পাননি যদি কেউ তাঁকে তেমন কোন সাক্ষ্য-প্রমান দিতে পারেন তবে তা তিনি বিবেচনা করবেন এবং এই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের মত হিসাবে ঘোষণা করেন যে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করে পৃথক রাজ্য হিসাবে গোর্খাল্যাণ্ড গঠনের দাবি কেন্দ্র কোন মতেই মেনে নেবে না। দ্বিতীয়ত, নেপাল চুক্তির সাত-এর ধারা পরিবর্তন করার যে দাবি জি-এন-এল-এফ করেছে তা মানা হবে না; তৃতীয়ত, স্বায়ত্ব শাসনের যে দাবি তোলা হয়েছে কেন্দ্র তা-ও মানবে না। তবে উত্তর বাংলার পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন ও অন্যান্য অভাব-অভিযোগের বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে উচিত আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসা। রাজীব গান্ধী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বুটা সিং সেই সময়ে জানান যে জি-এন-এল-এফ নেতা সুভাষ ঘিসিং অতীতে নেপাল প্রভৃতি বিদেশী

রাষ্ট্রের কাছে যে চিঠি দিয়েছিল তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে লিখিত এক পত্রে দুঃখ প্রকাশ করেছে।

এরপরে দার্জিলিঙ অঞ্চলে জি-এন-এল-এফ ও সি, পি, আই (এম) কর্মীদের মধ্যে বারে বারে সংঘর্ষ দেখা দেয়। উভয় পক্ষের মানুষের বেশ কিছু ঘর-বাড়ী জ্বলে যায় এবং উভয়পক্ষেই বেশ কিছু মানুষ হতাহত হয়। প্রধানমন্ত্রী একটি মন্তব্যে এই দুঃখজনক ঘটনাবলীর জন্য উভয় পক্ষকেই দায়ী করেন।

ডিসেম্বর মাসে বামফ্রন্ট কর্তৃক প্রকাশিত নির্বাচনী ইস্তাহারে গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলনকে 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দিলে (যদিও মাত্র কয়েকদিন আগেই প্রকাশিত প্রথম ইস্তাহারে তা বলা হয়নি) রাজ্য সি, পি, আই-এর পক্ষ থেকে প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে জানান হয় যে তারা এই আন্দোলনকে 'দেশদ্রোহী' মনে করেন না।

প্রধানমন্ত্রী ডিসেম্বরে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি এলাকার সঙ্গে দার্জিলিঙ সফরেও যান এবং সেখানে একটি প্রকাশ্য জনসভায় তার পূর্বোল্লিখিত ঘোষণাগুলি করে আসেন। ঐ জনসভায় যদিও অতি সামান্য সংখ্যক লোক যোগ দেয় এবং জি-এন-এল-এফ তা বয়কটের আহ্বান জানায়।

এরপরেই ঘটনা অতি দ্রুত মোড় নেয়। প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণক্রমে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ৭ই জানুয়ারী দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এক বৈঠকে ৭ই ফেব্রুয়ারী উভয়ে একত্রে দার্জিলিঙ-এ যাবার কথা এবং আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দসমেত সর্ব-দলীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দার্জিলিঙ ও নেপালী উপজাতির সমস্যা আলোচনার ঘোষণা করেন।

এরপরে স্বভাবতই ধীরে ধীরে দার্জিলিঙ জেলায় শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসতে দেখা যাচ্ছে এবং গোর্খাল্যাণ্ডের দাবিতে আশু আন্দোলনের যে কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছিল তা প্রত্যাহার

হয়েছে। ধীরে ধীরে আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় নেপালীদের অভাব-অভিযোগগুলি দূর করার অভিমুখে পরিস্থিতি প্রস্তুত হচ্ছে। আশা করা যায় যে শাসক শক্তি ও নব জাতীয়তা চেতনায় উদ্বুদ্ধ ভারতীয় নেপালী এই উভয়পক্ষই সমগ্র ভারতবর্ষের ঐক্য ও সংহতির বৃহত্তর স্বার্থে সৎ যুক্তিবুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে সমগ্র সমস্যার এক শুভ মীমাংসায় উপনীত হতে সক্ষম হবে।

উত্তর-খণ্ড, ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি আন্দোলন ঃ

ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিশেষ করে পার্বত্য ও বনাঞ্চলে ছড়িয়ে আছে অগণিত আদিবাসী উপজাতীয় গোষ্ঠি। সুদীর্ঘকাল ধরে ভারতে প্রসারিত আধুনিক সভ্যতার প্রভাব এড়িয়ে এরা অত্যন্ত রক্ষণশীলভাবে নিজেদের সুপ্রাচীন ভাষা, ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি, জীবনধারণ পদ্ধতি ও কমবেশী প্রাচীনতম প্রাকৃতিক অর্থনীতি বজায় রেখে চলেছে। ইংরেজ শাসনাধীনে এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আধুনিক শিল্প-সভ্যতা, অতি ধীরে ধীরে হলেও, বিশেষ করে প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধানে আদিবাসী অধ্যুষিত দুর্গম পর্বত ও বনাঞ্চলে অনুপ্রবেশ করেছে। ফলে আধুনিক শিল্পে বেশ কিছুকাল ধরে ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যায় আদিবাসী স্ত্রী-পুরুষ অনিচ্ছা সত্বেও কুলি-মজুর হিসাবে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে। বনাঞ্চল-গুলির উপরে সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে আদিবাসীদের বন-নির্ভর স্বাধীন জীবন-যাপনের সুযোগও সঙ্কুচিত হয়েছে। টাকা-পয়সাভিত্তিক আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এদের জীবনে অনুপ্রবেশ করে খুব বেশী না হলেও কিছুটা পরিমানে এদের জীবন-যাপন পদ্ধতিকে প্রভাবিত করেছে। সরকারী পরিকল্পনা অনুসারে চাষ-বাসের সুযোগ-সুবিধা, পথঘাট সম্প্রসারণ, শিক্ষা-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ প্রভৃতির ফলে আদিবাসী গোষ্ঠিগুলির সভ্য সমাজ থেকে শত শত বৎসরের বিচ্ছিন্নতা, তাদের চিরাচরিত রীতিনীতি, অভ্যাস —এসব কিছুর ভিত টলে যাচ্ছে।

আদিবাসী গোষ্ঠিগুলির মধ্যেই অতি ধীরে ধীরে হলেও একটি শিক্ষিত সম্প্রদায় গড়ে উঠছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনীতির প্রচার এদের মধ্যেও সম্প্রসারিত হয়েছে, তেমনি প্রতিটি গোষ্ঠির মধ্যেই অনাদিবাসী মানুষ সম্পর্কে আদিবাসীদের চিরাচরিত সন্দেহ ও অবিশ্বাসকে ভিত্তি করে আদিবাসী গোষ্ঠিগুলির স্বার্থ রক্ষার দাবিতে আদিবাসীদের নিজস্ব রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক নেতা সৃষ্টির প্রবণতা বেশ কয়েক বছর ধরে জোরাল হতে দেখা যাচ্ছে।

কয়েক দশক ধরে বিহারের ছোটনাগপুর ও রাঁচি জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার কতক অংশে বসবাসকারী সাঁওতাল, হো, মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতীয় গোষ্ঠি তাদের নিজেদের রাজনৈতিক দল গড়ে এইসব উপজাতিগুলির নিজস্ব স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে ঝাড়খণ্ড রাজ্য গড়ে তোলার দাবি জানিয়ে আসছে। এই অঞ্চলের আদিবাসীদের নিজস্ব দল ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা এ যাবৎকাল নির্বাচনী রাজনীতির টানাপোড়েনে কখনও প্রায় ভেঙ্গে গেছে আবার কখনও বা জোরাল হয়ে উঠেছে। এইভাবে ভাঙ্গা-গড়ার ফলে ঝাড়খণ্ড প্রান্তের দাবি আজ পর্যন্ত কখনই খুব জোরাল হয়ে উঠতে পারেনি কিন্তু তবুও লক্ষ্য করা যায় যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্য প্রদেশের সংলগ্ন বিশাল বনাঞ্চল জুড়ে বসবাসকারী আদিবাসী উপজাতিগুলির নিজস্ব জাতিসত্বাগত চেতনা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই সঙ্গে বর্দ্ধিত হচ্ছে তাদের নিজস্ব ঝাড়খণ্ড প্রান্তের দাবির অনুকূলে রাজনৈতিক তৎপরতা। গত কয়েক বছর ধরে কিছু কিছু নকশাল রাজনৈতিক গোষ্ঠিও এই দাবির সমর্থনে আদিবাসীদের সংগঠিত করার কাজেও এগিয়ে যাচ্ছে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে এই আন্দোলনের পক্ষে আরও জোরাল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

উত্তর-বঙ্গের সমতলভূমি শিলিগুড়ি, কুচবিহার, মালদহ জেলার কিছু কিছু অঞ্চলে একইভাবে আদিবাসী উপজাতিদের কোন

কোন গোষ্ঠিকে নিজেদের পৃথকভাবে সংঘবদ্ধ করতে এবং এই উপ-জাতিগুলি অধ্যুসিত অঞ্চলকে নিয়ে 'উত্তরখণ্ড' গড়ে তোলার দাবি করতে শোনা যাচ্ছে।

এই ধরনের আরও কিছু কিছু আন্দোলন ভারতের অন্যান্য প্রান্তে আদিবাসী উপজাতিদের মধ্যে গড়ে তোলার প্রবণতাও দেখা যাচ্ছে।

এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে প্রায় সারা ভারতে ছড়ান এইসব আদিবাসি গোষ্ঠিগুলির নানা দিক থেকে অনাদিবাসী মানুষদের সঙ্গে পার্থক্য আছে। এদের নিজ নিজ ধর্ম, ভাষা জীবন-ধারন পদ্ধতি হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা অভ্যেস ও চিন্তার ধরণ অনাদিবাসী মানুষদের থেকে ভিন্ন এবং ঐতিহ্যসূত্রে চলে আসা তাদের নিজস্ব এই সংস্কৃতি গভীর মমতার সঙ্গেই তারা ধরে রাখতে চায়। এই কারণেই অনাদিবাসী মানুষ যারা আধুনিক সভ্যতার বিচারে সব দিক থেকে এগিয়ে থাকার ফলে প্রশাসন, শিক্ষা ও সামাজিক সব দিক থেকে আদিবাসীদের উপরে এক ধরনের প্রভুত্ব স্থাপন করেছে, তাদের প্রভাব থেকে নিজেদের জাতি-সত্বাকে বাঁচানোর জন্য আদিবাসী গোষ্ঠিগুলির মধ্যে সংগ্রামী চেতনা মাথা-চাড়া দিয়ে উঠছে।

সেই সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষা ও অর্থ নৈতিক দিক থেকে সমাজের সবচেয়ে পশ্চাদপদ অবস্থায় থাকার সুযোগ নিয়ে এগিয়ে থাকা অনাদিবাসী সমাজের মানুষদের দ্বারা দীর্ঘকাল ধরে এরা প্রতারিত শোষিত ও নিপীড়িত হয়ে এসেছে। আজ আদিবাসী গোষ্ঠিগুলি অনাদিবাসীদের দ্বারা শোষণ-নিপীড়নের হাত থেকে যেমন মুক্তি চায় তেমনই চায় নিজেদের অর্থ নৈতিক অগ্রগতি। এই সব কারনে খুব স্বাভাবিক ভাবে ন্যায়-সঙ্গত কারনে তাদের গ্রহণ করতে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে সংগ্রামের পথ।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ভারতের জাতীয় নেতৃত্ব আদিবাসীদের এই বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন নয়। এ পর্যন্ত সরকারীভাবে নানা ধরনের বিশেষ পরিকল্পনা ও অর্থ নৈতিক সাহায্য নিয়ে প্রশাসনের পক্ষে আদিবাসীদের কাছে এগিয়ে যাবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধান করলেই দেখা যায় যে যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা বাস্তবে সঠিকভাবে রূপায়িত হয়েছে খুব অল্প ক্ষেত্রেই এবং এটাও লক্ষ্য করা বিশেষ প্রয়োজন যে বাইরের লোকেরা অর্থাৎ ভিন্ন সাংস্কৃতিক-বোধ সম্পন্ন অনাদিবাসীরা আদিবাসীদের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং তাদের আশা-আকাঙ্খা পূরণের দিক থেকে কখনই কার্যকরীভাবে সাহায্য করতে পারে না। এ কাজে আদিবাসীদের নিজেদেরই সর্বক্ষেত্রে উদ্যোগ ও নেতৃত্ব নিতে হবে।

আজ যখন তাদের মধ্যে নিজ নিজ জাতি-সত্বা বিকাশের প্রেরণা দেখা যাচ্ছে, তাদের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে শিক্ষিত ও আধুনিক কলা-কুশলে দক্ষ মানুষ এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাও, তখন অবশ্যই এইসব নতুন উপাদানগুলিকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগিয়ে আদিবাসীদের ন্যায়-সঙ্গত আশা-আকাঙ্খা পূরণের পথ খুঁজে বার করতে হবে।

আদিবাসীদের জাতি-সত্বার প্রতি পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে তাদের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে দিতে পারার উপরেই নির্ভর করছে আদিবাসী জনগোষ্ঠির সঙ্গে অনাদিবাসী জনগোষ্ঠির ঐক্য ও সংহতির বিধানের সম্ভাবনা।

জাতীয়-সংহতির সমস্যা—বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে

ইদানিংকালে সারা ভারতবর্ষে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির সমস্যা ব্যপক আলোড়ন ও চিন্তার সূত্রপাত ঘটিয়েছে। অনেকের ধারণা এবং কোন কোন রাজনৈতিক দল এমন একটা প্রচার করে থাকে যে এই সমস্যাটা একমাত্র ভারতেরই নিজস্ব ব্যাপার এবং

এরজন্য মূলতঃ দায়ী আমাদের শাসন-ব্যবস্থা এবং ভারতের শাসকগোষ্ঠি। ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। বিশ্বের প্রতিটি দেশেই কমবেশী এই সমস্যা দেখা গেছে এবং এখনও যাচ্ছে। যেসব দেশে সব মানুষই এক ভাষাভাষি, এক ধর্মাবলম্বী এবং নৃতত্বগত ভাবে একই জাতি গোষ্ঠির অন্তর্ভূক্ত সেসব দেশে স্বভাবতই এই সমস্যার অস্তিত্ব নেই কিম্বা থাকলেও তা বড় কোন সমস্যার সৃষ্টি করে না। কিন্তু যেখানে ভাষা ধর্ম বা জাতিগত বিভেদ আছে সেখানেই আছে ঐক্য ও সংহতির সমস্যা।

গ্রেট ব্রিটেন বা ইউনাইটেড কিংডম এর নাগরিকরা সকলেই ইংরাজী-ভাষী ও খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী তা সত্বেও ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলসের মানুষদের মধ্যে বিভেদ সুস্পষ্ট এদের মধ্যে বিরোধও কিছু কম নয়। আধুনিক শিল্প, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও অর্থনীতি এই তিন রাজ্যে সমানভাবে বিস্তৃত হওয়া সত্বেও রীতি-নীতি, আচারব্যবহার প্রভৃতির দিক থেকে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য এদের বিভক্ত করে রেখেছে।

সুউন্নত জার্মান ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেও এই ধরনের বিভেদ ও ও বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাদা ও কালো মানুষের মধ্যেকার বিরোধ আইন করেও ঘুচান যায়নি। এখনও অত্যন্ত লজ্যাজনকভাবে এই বিরোধ হঠাৎ হঠাৎ যেখানে সেখানে দাঙ্গার রূপ নেয়।

ইউ-এস-এস-আর বা সোভিয়েত রাশিয়া একটি বহুজাতিক দেশ। যে কারণে তাদের সংবিধানে জাতিগত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য স্বীকার করে নিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় গড়া হয়েছে একটি ইউনাইটেড বা ফেডারেল রিপাবলিক এবং এই রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে

নিয়ে সার্বভৌমত্ব ঘোষনা করার অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত হলেও কোন রাজ্যই নিজেকে সেভাবে বিচ্ছিন্ন করে নেয়নি, অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতাবাদ সেখানে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেনি এবং আজ পর্যন্ত এদের মধ্যে সুঐক্য বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। কতকগুলি ব্যাপার তাদের এই সাফল্যের সহায়ক হয়েছে প্রথমত অনেকগুলি জাতি ও রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও এদের বৃহত্তম অংশ জুড়ে আছে রাশিয়ান জাতি ও রাষ্ট্র। এই রাশিয়ান জাতির রুশ ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি যেমন সুউন্নত তেমনই জাতিগত ভাবেও রাশিয়ান জাতি ইউ-এস-এস-আর এর অন্যান্য জাতিগুলির তুলনায় আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা কলা-কুশলতার দিক থেকে অগ্রসর। ফলে ইউ-এস-এস-আর এ রাশিয়ান জাতির পক্ষে স্বাভাবিক নেতৃত্বের ভূমিকা অপর সকল জাতিই মেনে নিয়েছে এবং সমগ্র রাশিয়ার ক্ষেত্রে রাশিয়ান জাতি ও রুশ ভাষা এক স্বাভাবিক ও শক্তিশালী ঐক্য বিধানকারী শক্তির (Cohesive force) ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছে। ভারতে রাশিয়ান জাতি ও রুশ ভাষার মত স্বাভাবিক ঐক্য বিধানকারী কোন শক্তি নেই।

দ্বিতীয়ত, সমগ্র ইউ-এস-এস-আর এ রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেছে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল—কমিউনিস্ট পার্টি এবং সেদেশে অপর কোন রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার স্বীকৃত নয়। অতি দৃঢ়ভাবে কেন্দ্রবদ্ধ এই কমিউনিস্ট পার্টিও জাতিগত ঐক্য বিধানের দিক থেকে মস্ত বড় ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে। ভারতে অবস্থাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস রুশ কমিউনিস্ট পার্টির মত যেমন কেন্দ্রবদ্ধ নয় তেমন সুশৃঙ্খলও নয় এবং এখানে শিখ ধর্মীয় গোষ্ঠির স্বার্থে আকালী দল, গোর্খাদের স্বার্থে জি-এন-এল-এফ, ঝাড়খণ্ডিদের স্বার্থে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, তামিলদের স্বার্থে ডি-এম-কে, তেলেগুদের স্বার্থে তেলেগু দেশম, অসমীয়াদের স্বার্থে আসু প্রভৃতি

সংকীর্ণ স্বার্থে রাজনৈতিক দল গড়ার অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় এদের পক্ষে ভারতে জাতি ধর্ম ও অঞ্চলগত বিভেদগুলিকে সামনে টেনে আনা খুবই সহজ হয়েছে।

তৃতীয়ত, সোভিয়েত রাশিয়াতে খ্রীশ্চান ও ইসলাম এই দুটি ধর্ম আছে। কিন্তু ভারতে যেমন হিন্দু, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম একই গ্রাম বা শহর বা অঞ্চলের মানুষরা অনুসরণ করে রাশিয়ায় ঠিক তেমন নয়। মূল রাশিয়ায় যেমন প্রায় সকলেই খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী তেমনই আবার ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা প্রধানত বাস করে দক্ষিণ এশিয়ার তাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, তাসখন্দ প্রভৃতি রাজ্যে। ফলে ভারতে হিন্দু-মুসলমান ও মন্দির-মসজিদের একই স্থানে অবস্থান হবার ফলে বিরোধ ও সংঘর্ষের সুযোগ যেমন রাশিয়াতে তা নয়। এই সঙ্গে ভারতে ধর্মের যেমন অবাধ কার্য্যকলাপ স্বীকৃত রাশিয়াতে সে সুযোগ দেওয়া হয়নি। ধর্মীয় কার্যকলাপকে সেখানে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও উপাসনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, ধর্মগুরু ও ধর্মীয় সংগঠনের পক্ষে প্রভাবশালী কোন ভূমিকা পালনের সুযোগ রাশিয়ায় অস্বীকৃত যেখানে গণতন্ত্রের নামে ভারতে রয়েছে এদের অবাধ অধিকার।

চতুর্থত, ভারতে যেমন পত্র-পত্রিকা, সংবাদ, পুস্তক-পুস্তিকা ও মতামত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা আছে রাশিয়ায় তেমন স্বাধীনতা নেই। এখানে যেমন মৌলবাদী, আঞ্চলিকতাবাদী, ধর্ম ও জাতি-দন্তী এমনকি বিচ্ছিন্নতাবাদীও ভারত রাষ্ট্রের স্বীকৃত নীতি-আদর্শ-বিরোধীরা অবাধে মতামত প্রকাশ ও সাংগঠনিক কার্যকলাপ চালানোর অধিকার ভোগ করে এবং যার যথেচ্ছ অপব্যবহার করা হয়ে থাকে রাশিয়ায় এ সুযোগ কোন দিনই ছিল না।

বহুজাতিক ও বহুধর্মের দেশ রাশিয়ায় এইসব কারণে জাতি-ধর্মগত বিভেদ-বিরোধ কখনই তেমন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে

পারেনি। কিন্তু আমাদের অনেকের মধ্যেই এমন একটা বিশ্বাস আছে যে রাশিয়ায় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের চিন্তা প্রসূত ও সাম্যবাদের মহান আদর্শ ভিত্তিক বিচক্ষণ-শাসন ব্যবস্থা থাকার ফলে আজ সেদেশে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির কোন সমস্যা থাকার প্রশ্নই নেই এবং বহুকাল পূর্বেই তা নির্মূল করে ফেলা সম্ভব হয়েছে। এই ধারনা ঠিক নয়। সংবাদে আমরা জানতে পারছি যে গত জানুয়ারী মাসেই সোভিয়েত রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী গরবাচেভ রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের কিছু অঞ্চলে হিংসাত্মক আন্দোলনের জন্য উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রবণতাকে দায়ি করেছেন এবং এর জন্য পূর্বতন ব্রেজনেভ প্রশাসনের কতকগুলি ভুল-ত্রুটি সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। অক্টোবর বিপ্লবের দীর্ঘ সত্তর বছর পরেও সোভিয়েত রাশিয়া যে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির সমস্যা থেকে সর্ণম্পূ মুক্ত হতে পারেনি গরবাচেভের অভিযোগটি অবশ্যই তার একটা নিশ্চিত প্রমাণ।

গত বছরে '৮৬ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জাতীয় সত্বার ক্রমবর্দ্ধমান বিকাশ ও ঘটিত সমস্যা বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সুপ্রাচীন রুশ তাত্বিক রাষ্টিশ্লাভ উলিয়ানভস্কি একটি গ্রন্থেও একথা উল্লেখ করেছেন যে রাশিয়াতে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির সমস্যা এখনও রয়ে গেছে।

ইংল্যাণ্ড, জার্মান, ফ্রান্স, আমেরিকা ও রাশিয়ার মত উন্নত দেশগুলি অনেক দিক থেকে অনেক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হলেও আজও সেসব দেশে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির সমস্যা কম-বেশী থেকে গেছে। বহুজাতিক ও বহুধর্ম আছে যে সব অনুন্নত দেশে সেখানে অবশ্যই এই সমস্যার গভীরতা ও ব্যপকতা বেশী। আফ্রিকা মহাদেশে শ্বেতকৃষ্ণের বিরোধ ও সংঘর্ষ এবং কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের উপরে শ্বেতাঙ্গদের বৈষম্যমূলক নীতি ও অত্যাচার আধুনিক বিশ্বের

পক্ষে এক নিদারুণ লজ্জার ব্যাপার। কিছুদিন আগেকার হিটলারের জার্মানে নৃশংস ইহুদিনিধন বিশ্বের পক্ষে ভোলা মুশকিল।

সারা বিশ্বের এইসব ঘটনার দিকে তাকিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে ভারতে যেহেতু রয়েছে বহু ভাষা, বহু ধর্ম ও নৃতত্ত্বগতভাবে বহু জাতি-উপজাতি এবং যেহেতু এইসব জাতি উপজাতিগুলির মধ্যে রয়েছে অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য এবং যেহেতু ভারত এখনও একটি পশ্চাদপদ দেশ ও দীর্ঘকালের উপনিবেশিক শৃঙ্খল ছিন্ন করে গ্রহণ করেছে উন্নয়নের কর্মসূচী সেইহেতু এইদেশে নতুন নানা ধরনের জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী বিভেদ ও বিরোধ দেখা দেওয়া মোটেই কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। সেই সঙ্গে এটাও বোঝা খুব কঠিন নয় যে চাইলেও এবং চেষ্টা করলেও রাতারাতি প্রতিটি সমস্যার নিরসন করা যাবে না। যেহেতু সমস্যাটি মানুষের চিন্তা চেতনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন যেহেতু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার সেইহেতু জাতীয় ঐক্য ও সংহতি স্থাপনের কর্মসূচী দীর্ঘস্থায়ী হতে বাধ্য।

সাম্রাজ্যবাদী প্ররোচনা

ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির সমস্যার পিছনে যে সাম্রাজ্যবাদের সুপরিকল্পিত তৎপরতা বর্তমান তার যেমন লিখিত তেমনই কার্যগত প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। ভারত চায় স্বনির্ভর হতে এবং তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুনিশ্চিত করতে ; ভারত চায় পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে জোট নিরপেক্ষতা ও সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ও অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সব দেশের স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়াতে ; ভারত চায় সব দেশের সঙ্গেই সমমর্যাদার ভিত্তিতে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে এবং সোভিয়েত রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে কালোত্তীর্ণ বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সহযোগীতার সম্পর্ক বজায় রাখতে ও তা আরও বৃদ্ধি করতে।

ভারতের এই মৌলিক নীতিগুলি ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির পছন্দ নয়। বিশেষতঃ ভারত যে একটি শক্তিশালী ও স্বাধীন অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর এবং বিশ্বের শতাধিক দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে ভারত যে ইতিবাচক জোট-নিরপেক্ষতার আন্দোলন গড়ে তুলেছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এই কারনে ভারতকে মোটেই সুনজরে দেখতে পারছে না। তারা ভারতের অভ্যন্তরে গোলযোগ ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে এবং শেষ পর্যন্ত ভারতের অভ্যন্তরের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে সহায়তা যুগিয়ে ভারতকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলতে পরিকল্পিত কার্যক্রম অনুসারে এগিয়ে চলেছে। সারা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের পরিচলন কেন্দ্র মার্কিন পেন্টাগণের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা রচিত ভারতকে খণ্ড-বিখণ্ড করার পরিকল্পনা তাদের নির্ভরযোগ্য লোকেরাই ইতিমধ্যে প্রকাশ করে দিয়েছে।

এই পরিকল্পনা ছাড়াও ভারতের জাতিগত বিরোধের ক্ষেত্রে তাদের সক্রিয় সহযোগীতার প্রমাণ আমরা পেয়েছি নাগা ও মিজোদের দীর্ঘকালীন বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র বৈরীতার ক্ষেত্রে, আসামে 'বিদেশী খেদাও, আন্দোলনের পিছনে, খলিস্তানী সন্ত্রাসবাদীদের সব রকমে সহায়তা দানের ক্ষেত্রে, ভারত থেকে জম্মু ও কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘে পাকিস্তানকে মদত দেবার ক্ষেত্রে এবং ভারতকে ঘিরে পাকিস্তান, চীন, নেপাল বাংলাদেশ,শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশকে কেন্দ্র করে ভারত-বিরোধী তৎপরতা চালিয়ে যাবার মধ্যে। ভারতের অভ্যন্তরে প্রভাবশালী লোকেদের মধ্যে থেকেও ধরা পড়েছে ভারত-বিরোধী কাজে লিপ্ত সাম্রাজ্যবাদী চক্রের সঙ্গে যুক্ত চর-চক্র।

সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ভারতের যেখানে সেখানে সম্ভব বিভেদকামী শক্তিগুলিকে যেমন দেশে অস্থিরতা ও আন্দোলন সৃষ্টির কাজে প্ররোচনা জোগাচ্ছে তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের ন্যায়-সঙ্গত দাবী ও ভাবাবেগ

সঞ্জাত আন্দোলনকে ঠেলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে বিচ্ছিন্নতাবাদের পথে।

সাম্রাজ্যবাদের এই ভারত বিরোধী চক্রান্ত সম্পর্কে আমাদের খুবই সজাগ থাকতে হবে। কিন্তু ভাষা, আঞ্চলিকতা, উপজাতীয় বা জাতিসত্বার স্বীকৃতির দাবীতে যে কোন আন্দোলনকেই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ফল হিসাবে ভাবা যেমন আমাদের পক্ষে ভুল ও ক্ষতিকর হবে তেমনই মনে রাখা দরকার যে যেকোন আন্দোলনের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী প্ররোচনা থাকলেও সাধারণ মানুষ অনেক সময়েই ধর্মীয় বা জাতিসত্বাগত ভাবাবেগ তাড়িত হয়ে ঐ আন্দোলনে যেমন যোগ দিতে পারে তেমনই আন্দোলনের কিছু দাবি জাতীয় স্বার্থ-বিরোধি উদ্দেশ্য-প্রনোদীত হলেও আরও কিছু দাবি অবশ্যই থাকতে পারে যা ন্যায়-সঙ্গত ও সাধারণ মানুষের স্বার্থের অনুকূল। এই কারণে গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ না করে এমন কোন আন্দোলন যার মধ্যে ব্যাপক জনসাধারণ যুক্ত হয়ে পড়েছে তাকে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ঘোষণা করে সর্বাত্মক বিরোধীতায় নেমে পড়া উচিত নয়।

আসাম আন্দোলনের মধ্যে যখন মীমাংসা-বিরোধী ও সন্ত্রাসবাদী ঝোঁক স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তখন কোন কোন রাজনৈতিক নেতা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কঠোরভাবে এই আন্দোলনকে দমন করার দাবী জানিয়েছিল এবং কোন কোন দল এই আন্দোলনকে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত হিসাবে চিহ্নিত করে সোরগোল তুলেছিল। তৎকালীন বিচক্ষণ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা এবং এর পিছনে সাম্রাজ্যবাদের যোগসাজশ আছে-এ কথা স্বীকার করলেও কখনই কঠোর ভাবে তিনি এই আন্দোলনকে দমন করতে ব্যবস্থা নেননি। যেহেতু এই আন্দোলনের সঙ্গে ব্যাপক অসমীয়া জনসাধারণ জড়িত ছিল। তাই তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলনের পশ্চাতে যে ন্যায়-সঙ্গত কারণগুলি ছিল

তা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার আন্তরীক চেষ্টা করে গেছেন। তিনি আরও জানতেন যে আন্দোলনের কোন কোন নেতা গোপনে সাম্রাজ্যবাদী চক্রের সঙ্গে যুক্ত হলেও সব নেতাই কোন মতে জাতীয়তা বিরোধী নয়। পাঞ্জাবের ক্ষেত্রেও যেমন ছিল ভিনড্রানওয়ালা ও সাম্রাজ্যবাদী সাহায্যপুষ্ট বহু উগ্রপন্থী তেমনই আবার লাঙ্গোয়ালের মত নেতারা। আকালীদলের বৃহত্তর অংশ এবং ব্যাপকভাবে শিখ জনসাধারণ সাময়িকভাবে ভাবালুতার দ্বারা পরিচালিত ও বিভ্রান্ত হয়ে থাকলেও তারা যে মূলতঃ দেশপ্রেমিক— এ প্রত্যয় ইন্দিরা গান্ধীর ছিল। তাই সন্ত্রাসবাদ দমনে কঠোরতা গ্রহণ করলেও তিনি অত্যন্ত ধীর-স্থীরভাবে আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাদের ন্যায়-সঙ্গত দাবীগুলির মীমাংসার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

ইন্দিরা গান্ধীর এই দৃষ্টিভঙ্গী ও মৌলিক নীতি অনুসরণ করে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও তৎপরতার সঙ্গে আসাম ও পাঞ্জাব সমস্যাকে আন্দোলনকারী নেতাদের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে এবং দ্রুত নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠা করে সমাধানের পথে এগিয়ে নিয়ে যান।

গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলন শুরু হতেই বামফ্রন্ট সরকার একটু তাড়াহুড়ো করেই এই আন্দোলনকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' ও 'দেশদ্রোহী' বলে চিহ্নিত করে এর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণে অগ্রসর হয়। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলন পরিচালক সংস্থার নাম গোর্খাজাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট হওয়া এবং বিদেশী কোন রাষ্ট্রকে ঐ সংস্থার পক্ষ থেকে চিঠি লেখা ইত্যাদি ঘটনার কারণে প্রথম দৃষ্টিতেই এই আন্দোলনকে সাম্রাজ্যবাদীদের পরিকল্পনা অনুসারে সৃষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে মনে হতে পারে এবং পাঞ্জাবের আন্দোলনের তিক্ত অভিজ্ঞতার পরে বিচ্ছিতাবাদী প্রবণতা সম্পর্কে কিছুটা আতঙ্কিত হয়েই সম্ভবত বামফ্রন্ট সরকার এই আন্দোলনকে ঐভাবে চিহ্নিত করে এর সর্বাত্মক বিরোধীতায় নেমে পড়ে। যদিও কাজটি

সম্ভবতঃ সঠিক হয়নি এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মীমাংসার পথ রুদ্ধ করে আন্দোলনকারীদের দমন করার জন্য শুধু লাঠিগুলির উপরে নির্ভর করার ফলে আমাদের সেনাবাহিনীর একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্বস্ত অংশ গোর্খাদের মধ্যে ভারত-বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তোলার আশঙ্কাও এর ফলে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু আমাদের নবীন অথচ বিচক্ষণ প্রধানমন্ত্রী দৃঢ় ও প্রসংশনীয় তৎপরতা নিয়ে এই আন্দোলনের সামনে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথ উন্মুক্ত করে দিয়ে একটা মস্ত বড় কাজ করেছেন।

আমরা অবশ্যই আশা করব যে দলমত নির্বিশেষে ভারতের দেশপ্রেমিক ও প্রগতিশীল মানুষ আসাম-পাঞ্জাব-গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলন থেকে মূল্যবান শিক্ষা নিতে সক্ষম হবে।

সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর আরও একটি ঘোষণা আমাদের সর্বদাই মনে রাখা দরকার — তা হ'লো — সাম্রাজ্যবাদ চক্রান্ত করছে ঠিকই এবং তাদের শক্তি সম্পদ ও যথেষ্ট কিন্তু আমাদের পক্ষে এতে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই, কারণ আমরা নিজেদের অভ্যন্তরীন সমস্যাগুলি মিটাতে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সঠিক পদক্ষেপ যদি গ্রহণ করতে সক্ষম হই তবে বাইরের হস্তক্ষেপ — তা যতই শক্তিশালী হোক না কেন আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রীর এই দৃঢ় প্রত্যক্ষও আছে যে আমাদের অভ্যন্তরীন সমস্যাবলী মিটিয়ে ফেলতে অবশ্যই আমরা সক্ষম হব।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নিঃসন্দেহেই আজকে ভারতকে খণ্ড-বিখণ্ড করতে খুবই তৎপর কিন্তু তা সত্ত্বেও এতে আতঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই, বরঞ্চ আতঙ্কিত হয়ে চারিদিকে সাম্রাজ্যবাদের ভূত দেখা এবং আমাদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি "গেল গেল" রব তোলাই ক্ষতিকর।

ভারতের বিশিষ্টতা

বিশ্বের অন্যান্য দেশে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নে সমস্যা থাকলেও এটা লক্ষ্য করা যায় যে সব দেশের এই সমস্যার ধরণ ঠিক একই রকম নয়। প্রতিটি দেশেরই নিজস্ব কিছু বিশিষ্টতা থাকে, যে বিশিষ্টতা ভিন্ন ভিন্ন দেশে সমস্যাটিকে দেয় ভিন্নতর রূপ এবং স্বভাবতই প্রতিটি দেশকেই তার নিজস্ব বিশিষ্টতা অনুসারে ঐ সমস্যা সমাধানের নিজস্ব পথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়।

ভারতেরও তেমনই কতকগুলি নিজস্ব বিশিষ্টতা আছে। জাতীয় সংহতি সমস্যার সঠিক উপলব্ধি ও তার সমাধানের উপায় নির্ধারণের জন্য যে বিশিষ্টতাগুলিকে অবশ্যই আমাদের অনুধাবন করতে হবে।

প্রথমত লক্ষ্য করা যায় যে নৃতাত্বিক দিক থেকে বিভিন্ন গোষ্ঠির মানুষের সমাবেশ ঘটেছে এই ভারতবর্ষে এবং ঐ গোষ্ঠিগুলি নানা ভাবে মিশ্রিত হয়ে সৃষ্টি করেছে নানা ধরনের মিশ্র জাতির মানুষে। ভারত একটি সুপ্রাচীন দেশ। প্রমাণ পাওয়া যায় যে মানব সমাজের একেবারে আদিতম কাল থেকেই এদেশে জনবসতি বর্তমান ছিল। বাইরে থেকে বারে বারে বহু জাতি-উপজাতির মানুষ এদেশে এসে স্থায়ী ভাবে বসবাস স্থাপন করেছে এবং এদেশের মানুষের সঙ্গে মিশে গেছে। হাজার হাজার বছর ধরে এর সামাজিক কাঠামো থেকে গেছে প্রায় অপরিবর্তিত। ফলে ভারতের ভৌগোলিক বৈচিত্র্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন গোষ্ঠির মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করার ফলে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও উপজাতির মানুষে। এই সব জাতি-উপজাতির যেমন আছে শারীরিক গঠন ও গাত্রবর্ণের ভিন্নতা তেমনই আছে পোষাক-আষাক, সামাজিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, ভাষা-সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতির ভিন্নতা। আর এই সব বৈচিত্র্য একদিনে গড়ে ওঠেনি এগুলি ঐতিহ্যগত ভাবে বদ্ধমূল হয়েছে হাজার

হাজার বছরের অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে। ফলে এই বৈচিত্র্যগুলির চট্-জলদি পরিবর্তন আশা করা খুবই ভুল হবে।

বিশ্বের বহুদেশে দেখা দেছে যে কোন একটা সময়ে উত্থিত বিশেষ কোন ধর্ম বলপ্রয়োগের দ্বারা নিজেকে দেশ বিশেষের প্রাচীন সব ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতি-নীতিকে ধ্বংস করে সেই দেশের সমস্ত মানুষের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। ভারতে কিন্তু তেমনটা ঘটেনি। বলপ্রয়োগের দ্বারা কোন একটি ধর্মমত বা দার্শনিক জীবন-বীক্ষাকে সমগ্র দেশে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়নি। বিপরীত পক্ষে এটাই এদেশের বিশিষ্টতা যে বিভিন্ন ধরনের ধর্মমত এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান একই সঙ্গে বিভিন্ন গোষ্ঠির মানুষ কর্তৃক অনুসৃত হয়েছে, একে অপরকে বিনা দ্বিধায় সহ্য করেছে ও মেনে নিয়েছে। এর ফলে সারা দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বহু বিচিত্র ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতিনীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। 'হিন্দু' নামে পরিচিত ভারতবর্ষে অনুসৃত ধর্মকেও বহু বিচিত্র ধর্মমতের সমাহার যায় মধ্যে ঘটেছে তা কখনই একেশ্বরবাদ মেনে নেয়নি এবং বাইবেল বা কোরানের মত একটি বিশেষ শাস্ত্রগ্রন্থের নিয়ন্ত্রণও মেনে নেয়নি। ফলে ভারতবর্ষ বহু বিচিত্র ধর্মমতে বিশ্বাসী মানুষের সহাবস্থানের দেশ হিসাবে গড়ে উঠেছে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের প্রচণ্ড শক্তিশালী কোন কোন ঘটনা বিভিন্ন দেশের পুরাতন ধ্যান-ধারনা—প্রাচীন জীবন-দর্শন ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এনে দিয়েছে আমূল পরিবর্তন। ইউরোপ থেকে লক্ষ লক্ষ ইউরোপীয় আমেরিকা ভূ-খণ্ডে বসবাস ও উপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন প্রাচীন আমেরিকাকে ধুয়েমুছে এক নতুন মার্কিন সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। ইউরোপ ভূ-খণ্ডে বারে বারে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ অত্যন্ত গভীর ভাবেই সে দেশের প্রাচীন চিন্তা চেতনাকে আলোড়িত করে যায়। তারপর ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মে

সেখানে দেখা দেয় রেনেসাঁস, ধর্ম-সংস্কারের ব্যপক ও দীর্ঘস্থায়ী লড়াই, তারই ফলে দেখা দেয় নতুন জ্ঞান-পিপাসা ও জ্ঞান-চর্চা —যা ইউরোপে প্রাচীন সব ধ্যান-ধারনাকে মুছে দিয়ে আনে নতুন প্রাণবান যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ, বিজ্ঞন-মনস্কতা ও মানুষের সৃষ্টিশীল ক্ষমতায় গভীর প্রত্যয়। যে চিন্তার পথ ধরে আসে নানা যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও শিল্প-বিপ্লব। সৃষ্টি হয় এক আধুনিক ইউরোপ।

রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লব পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা ও ধ্যান-ধারণাকে ভেঙ্গে চুরমার করে এক নতুন রাশিয়ার সৃষ্টি করে। চীনেও দীর্ঘদিনের চীন-জাপান যুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং সর্বোপরি কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত মহাবিপ্লব সুপ্রাচীন কনফুসিয়াস ও বৌদ্ধ চীনকে ভেঙ্গে নতুন চীনের জন্ম দেয়।

ভারতে এ ধরনের প্রলয়ঙ্করী কোন ঘটনা এর প্রাচীন চিন্তা-ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন আনেনি। দুইশত বছরের ইংরেজ উপনিবেশিক শাসন অবশ্যই একটা বড় কাজ করেছে—এ দেশের হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা গ্রাম-ভিত্তিক স্বয়ং-সম্পূর্ণ অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং সেই পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে ভারতের যোগ সাধন করার ফলে এদেশে জন্ম নিয়েছে এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে এই শ্রেণীরই নেতৃত্বে পশ্চিমের দেশগুলি থেকে আমদানি করা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার সাহায্যে চেষ্টা চলছে অর্থ নৈতিক অগ্রগতি সাধনের।

এই সব কিছুর ফলে ভারতে পরিবর্তন অবশ্যই ঘটেছে কিন্তু সে পরিবর্তন স্পর্শ করেছে কেবলমাত্র এর বাহ্যিক চেহারাকে—মানুষের চিন্তা-চেতনা এখনও বহুলাংশেই রয়ে গেছে প্রাচীন ধর্মীয় ভাবধারা ও জীবনবোধের গভীর মধ্যে। যে চিন্তাধারাকে আমরা

বলতে পারি মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা। শুধু যে গ্রামের মানুষই এই চিন্তাধারায় তলিয়ে আছে তা নয়, আধুনিক সাজ-পোষাক পরা শহরের মানুষদের মধ্যেও প্রাচীন ভাবধারা অর্থাৎ— যুক্তিহীন সংস্কারাচ্ছন্নতা, দৈবিক ও অতিপ্রাকৃত শক্তির উপরে বিশ্বাস, প্রকৃতবিজ্ঞান মনস্কতার অভাব, মানুষের সৃষ্টিশীল ক্ষমতায় প্রত্যয়ের অভাব, ভাগ্য পরলোক চিরাচরিত যুক্তিহীন আচার-অনুষ্ঠান আঁকড়ে ধরে থাকার প্রবণতা ইত্যাদি আজও কিছু কম নয়।

ভারতীয় মানুষের এই চিন্তাগত পশ্চাদপদতাই সেই উর্বর জমি যা সযত্নে লালন করে চলেছে ধর্মীয় গোড়ামী ও অন্ধতা, ভাষাগত অঞ্চলগত গোষ্ঠিও সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতা এবং যাবতীয় প্রগতি বিরোধী রক্ষণশীলতা। যার ফলে মানুষ অতি সহজেই প্ররোচনার শিকার হয়ে পড়ে।

এটা যেমন ভারতীয় মানষিকতার খারাপ বা দুর্বল দিক তেমনই আবার এর একটা ভাল দিকও আছে। উত্তর ও পূর্ব্ব হিমালয় পর্বতমালা এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমে মহাসাগর বাকি বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে যে ভারত উপমহাদেশকে এর অধিবাসীরা বিভিন্ন জাতি উপজাতিতে বিভক্ত হলেও এরা একে অপর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। প্রাচীনকাল থেকেই ঐতিহ্যসূত্রে এই সমস্ত জাতি উপজাতির মধ্যে রয়ে গেছে মানষিক ঐক্যের বন্ধন যা সব বৈচিত্র্য সত্বেও তাদের সকলকেই দিয়েছে এক ভারতীয়ত্বের উপলব্ধি।

প্রাচীন ভারতের ঋষিরা রচনা করেছিলেন বেদ উপনিষদের মত সুমহান ধর্মীয় দর্শন এক বিশ্ব-বিস্ময়। এই বেদ-উপনিষেদীয় চিন্তাধারাকে আরও বিকশিত করে ভারতে গড়ে উঠেছিল বেশকিছু যুক্তিতর্ক ভিত্তিক দার্শনিক চিন্তাধারা। এই দার্শনিক চিন্তাধারায় সাধারণ মানুষের বোধ-বুদ্ধি গ্রাহ্য করে তোলার জন্য রচিত হয়েছিল

অসংখ্য হৃদয়গ্রাহী পৌরানিক কাহিনী এবং রামায়ন মহাভারতের মত দুই অমর মহাকাব্য।

এইসব পৌরানিক কাহিনী ও মহাকাব্য দুটি ভাষা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগত পার্থক্য সত্বেও সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে গেছে এবং ভারতবাসী মাত্রের কাছেই তা উপস্থিত হয়েছে এক খাঁটি বিশ্বকোষ হিসাবে—যার থেকে আপামর ভারতবাসী সংগ্রহ করেছে তাদের সকল জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর নীতিবোধ, বাস্তব জীবনে চলার যাবতীয় পাথেয়। আজকের শহরের মানুষের চিন্তা-চেতনা কিছুটা ভিন্ন খাতে বইলেও সমগ্র গ্রাম ভারতের মানুষের হৃদয়পটে এখনও জীবন্ত হয়ে আঁকা হয়ে রয়েছে রামায়ন মহাভারতের অসংখ্য চরিত্র ও তাদের শিক্ষা।

এই শিক্ষাই যুগ-যুগান্তর ধরে ভারতের মানুষকে যুগিয়ে এসেছে অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট-লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার অপরিমেয় শক্তি এবং এই শিক্ষাই এক ভারতীয়ত্বের চেতনায় সকল ভারতবাসীকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করেছে। এই কারণে ভারত ভূ-খণ্ডের প্রতিটি অধিবাসীর পরিচয় যেমন একদিকে বাঙ্গালী, বিহারী, গুজরাটী বা পাঞ্জাবী কিংবা কোল, ভিল, সাঁওতাল বা মণ্ডা তেমনি আবার জাতীয় পরিচয়ের দিক থেকে ভারতীয়ও।

ভারতের এই বৈচিত্র্য ও ঐক্য গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন ভারত-চেতনার প্রতীক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতারাও ভারতের এই বিশিষ্টতাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারই ফলে বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন জাতি-উপজাতিতে বিভক্ত ভারতের কথা মনে রেখে ভারত রাষ্ট্রকে ঘোষণা করা হয়েছে ধর্ম-নিরপেক্ষ বা সেকুলার হিসাবে এবং বৈচিত্র ও ঐক্য উভয় উপাদানের স্বীকৃতি হিসাবে যেমন একটি সংযুক্ত বা ফেডারাল রাষ্ট্রের অনেক বিশেষত্ব সংবিধানে গৃহীত হয়েছে

সেইসঙ্গে আবার ঐক্যসূত্র হিসাবে রাখা হয়েছে জোরাল ভাবে কেন্দ্র বদ্ধতার সর্তও। আমাদের বিচক্ষণ ও চিন্তাশীল সংবিধান প্রণেতারা ভারত রাষ্ট্রের বিশিষ্টতাকে যথাযথভাবে সংবিধানে প্রতিফলিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই বহু দুর্বলতা ও প্রতি-কূলতা সত্বেও গত চল্লিশ বছর ধরে ভারতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকে থাকতে নিজেকে শক্তিশালী করতে এবং ভারত রাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সক্ষম হয়েছে।

ভারত রাষ্ট্র ধর্ম-নিরপেক্ষ। আধুনিক বিশ্বের উন্নত সকল রাষ্ট্রই ধর্ম-নিরপেক্ষ। কিন্তু অন্যান্য বহু দেশের ধর্ম নিরপেক্ষতার দৃষ্টি-ভঙ্গীর সঙ্গে ভারতের ধর্ম-নিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আছে। বহু দেশে রাষ্ট্র ধর্মবিষয়ে নির্বিকার এবং ভূমিকা-বিহীন। ভারতে ঠিক তা নয়। যেসব দেশে সকল নাগরিক একই ধর্মাবলম্বী এবং ধর্ম সংক্রান্ত তেমন কোন সমস্যা নেই সেসব দেশের রাষ্ট্রের পক্ষে ধর্মবিষয়ে নির্বিকারত্ব খুবই সঠিক। কিন্তু ভারতে ধর্মবিষয়ে বাস্তব-অবস্থা রাষ্ট্রের পক্ষে নির্বিকার ভূমিকার অনুকূল নয়। ধর্মের দিক থেকে যারা সংখ্যালঘু এবং বর্ণভেদের ফলে যে নিম্নবর্ণের মানুষেরা দুর্বল ও অবহেলিত সামাজিক দিক থেকে ধর্মীয় সংখ্যাগুরু অংশের সদস্যদের স্বার্থপরতার দ্বারা তারা যাতে প্রবঞ্চিত না হয় তার দিকে রাষ্ট্রকে দৃষ্টি দিয়ে সংখ্যালঘু ও দুর্বল সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

এই দিক থেকে বলা যায় যে ভারত-রাষ্ট্রের ধর্ম-নিরপেক্ষতার অর্থ ধর্ম বা ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে নির্বিকারও নয় বরঞ্চ ঠিক এর উল্টো। সকল ধর্মের মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজনে ভারত রাষ্ট্র সকল ধর্ম সম্পর্কে সমান আগ্রহী। এটা ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিষয়ে একটা নতুন চিন্তা, এক ধরনের নতুন পরীক্ষা। সুতরাং এর সঠিকতা ও সাফল্য অবশ্যই নির্ধারিত হবে সময়ের কষ্টিপাথরে।

ভারতের ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নে অনেকের মধ্যেই এমন একটা অবৈজ্ঞানিক চিন্তা আছে যে ভারতীয়দের মধ্যে ধর্মীয় পার্থক্য, ভাষাগত পার্থক্য জাতি-উপজাতিগত পার্থক্য— এইসব পার্থক্য-গুলিই জাতীয় ঐক্য ও সংহতির পথে সমস্যার সৃষ্টি করেছে সুতরাং এই সমস্যা সমাধানের সহজ রাস্তা হল আইন করে বা রাষ্ট্রীয় কঠোর নীতি অবলম্বন করে এইসব পার্থক্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা বা কোন রকমেই তাদের প্রশ্রয় না দেওয়া। ভারতবাসী মাত্রেরই একটি মাত্র পরিচয় হবে—তা হ'ল তারা 'ভারতীয়' অন্য কিছু নয় এবং তারা সকলে হবে একটাই ধর্মের অনুসারী তা হ'ল 'মানবধর্ম' (কেউ কেউ মনে করে তা হোক 'হিন্দু ধর্ম')।

কথাগুলি শুনতে ভাল হলেও এ হ'ল অবাস্তব, অবৈতনিক ও ক্ষতিকর চিন্তা। কারণ মানুষকে কখনও নিছক যন্ত্রের মত পাল্টান বা পরিচালনা করা যায় না। শুধু যুক্তিবুদ্ধি দিয়েই মানুষ চলে না। মানুষের হৃদয়বৃত্তি বলে একটা জিনিষ আছে। যুগ-যুগান্তরের বিশ্বাস, ধর্মবোধ, ন্যায়-নীতিবোধ — এসব মানুষের কতকটা মজ্জাগত ব্যাপার যা সহজে পাল্টায় না। এই কারণে মানুষ ধর্মযুদ্ধে অক্লেশে প্রাণ দেয়। শতবর্ষ ধরে ধর্মযুদ্ধ চালাতে মানুষ দ্বিধা করে না। কয়েক দশক ধরে বস্তুবাদী কমিউনিষ্ট শাসনাধীন থাকার পরেও আমরা দেখেছি পোল্যাণ্ডে ধর্মীয় আন্দোলনের কি বিশাল শক্তি। সোভিয়েত রাশিয়াতে এত দীর্ঘকাল কমিউনিষ্ট শাসন বস্তুবাদী শিক্ষা সংস্কৃতি বিস্তারের পরেও কোটি কোটি মানুষ আজও সেখানে ধর্মে বিশ্বাসী।

মানুষের এই হৃদয়বৃত্তিকে অস্বীকার করা ভুল। ব্যক্তিগত ভাবে কিছু কিছু মানুষ অবশ্যই ধর্ম পাল্টাতে পারে, ধর্মকে অস্বীকার করে নাস্তিক হয়ে যেতে পারে। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে অস্বীকার করে নিজেকে বিশ্বমানবের একজন বলে চিন্তা করতে পারে। কিন্তু একটা সমগ্র জাতি তা পারে না।

এই কারণে ধর্মীয় বা জাতিসত্বাগত বা ভাষাগত হৃদয়বোধকে অস্বীকার করে এগিয়ে যাবার উপায় নেই। যা সম্ভব এবং সম্ভব বলেই উচিত ও শুভ তা হ'লো প্রত্যেক ধর্ম। প্রত্যেক জাতিসত্ব প্রত্যেক গোষ্ঠির নিজস্ব ভাষাগত আশা-আকাঙ্খার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, প্রত্যেক মানুষ বা মানবগোষ্ঠিকে অন্যের ক্ষতি না করে নিজস্ব বিশ্বাস অনুযায়ী নিজ নিজ বৈষয়িক, আত্মীক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সুযোগ অবারিত করে দেওয়া।

আমাদের দেশে কতগুলি ধর্ম কতগুলি ভাষা বা কতগুলি জাতি-উপজাতি আছে তা দিয়ে কখনই আমাদের ঐক্যের পরিমাপ হয় না। এই ধরনের অসংখ্য বৈচিত্র বা পার্থক্য সত্বেও আমরা এক ভারতীয় মহাজাতি হিসাবে অবশ্যই দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারি। গান্ধীজি বলতেন যে প্রতিটি মানুষ যদি এক একটি পৃথক ধর্ম অনুসরণ করে তাতে কোনই ক্ষতি নেই বরঞ্চ তা হবে আমাদের স্বাধীন চিন্তাক্ষমতার পরিচায়ক। একজন ভাল বাঙ্গালী বা ভাল পাঞ্জাবী বা ভাল সাঁওতালীর পক্ষে সেইসঙ্গে ভাল ভারতীয় হতে কোন বাধাই নেই। আর একমাত্র এই ভাবেই প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্মমত বা জাতিসত্বা বজায় রেখেই আমরা ভারতীয় হিসাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারি।

অতি প্রাচীন কালে ভারতীয় প্রজ্ঞা এই উদার দৃষ্টিভঙ্গীই গ্রহণ করেছিল। আর তা করেছিল বলেই সে ধর্মের নাস্তিক-শিরোমনি বৃহস্পতি যিনি বেদ ব্রাহ্মণ, ঈশ্বর প্রভৃতিকে দ্বিধাহীনভাবে তাঁর দার্শনিক মতের ক্ষেত্রে অস্বীকার করেছিলেন তাঁর মতকে মেনে না নিলেও ভারত তাঁকে ঋষি বৃহস্পতি হিসাবে সম্মান করেছিল শ্রদ্ধা করেছিল। ঋষি বৃহস্পতির অনুসারী চার্বাক প্রমুখ বেদ-বিরোধী দার্শনিকদের বৈদিক ভারতবর্ষ ব্যাপকভাবেই গ্রহণ করেছিল —যার ফলে তাদের দার্শনিক চিন্তাধারা লোকের দ্বারা গৃহীত এই অর্থে লোকায়ত নামে পরিচিত হয়েছিল। এই দার্শনিক চিন্তার

পাশাপাশি একই সময়ে ভারতে সম্প্রসারিত হয়েছিল সাংখ্যবাদ—যাতে ঈশ্বরের চেয়ে প্রাধান্য বেশী দেওয়া হয়েছিল বস্তুজগতকে, ছিল যোগ-দর্শন—যা এই বস্তুজগতের কেন্দ্রে ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠা করেছিল, ছিল ন্যায় ও দর্শন—যা মনে করত বিশ্ব সৃষ্টির মূলে আছে অবিনশ্বর পরমানুপুঞ্জ ছিল মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন—যা বিশ্বাস করত বস্তুজগত মায়ামাত্র এবং 'পরম ব্রহ্মই' একমাত্র সত্য। প্রাচীন ভারতীয় প্রজ্ঞার এটাই বৈশিষ্ট যে একই সঙ্গে পরস্পর বিরোধী এতগুলি ধর্মীয়-দার্শনিক মত পাশাপাশি সহাবস্থান করেছিল। এ ছাড়াও ধর্মের ক্ষেত্রে ছিল প্রাচীন তান্ত্রিক সম্প্রদায়, বিষ্ণুর উপাসক—বৈষ্ণব সম্প্রদায়, শাক্ত, শৈব, জৈন, বৌদ্ধ ও আরও ছোট বড় নানান সম্প্রদায়। এঁরা যে শুধু একে অপরের প্রতি সহনশীলতাই দেখিয়েছে তা-ই নয় সেই সঙ্গে এরা অপরের কাছ থেকে গ্রহণও করেছে অনেক কিছু। যার ফলে নিরিশ্বরবাদী বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে ঢুকে পড়েছে পৌত্তলিকতা ও পূজা-পার্বন। বুদ্ধদেবও স্বয়ং পরিগণিত হয়েছেন হিন্দুধর্ম অবতার হিসাবে। বৈদিক ধ্যান-ধারণা আচার-অনুষ্ঠান সামাজিক বৈবাহিক রীতিনীতি প্রভৃতি অনায়াসে ও নির্বিবাদে মিশে গেছে এদেশের সনাতন-অবৈদিক বা অনার্য ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতিনীতির সঙ্গে।

এইভাবে হিন্দু ধর্মের মধ্যে বিগত হাজার হাজার বছরে সংঘটিত হয়েছে বহু পরিবর্তন। এই ধর্ম অপরিবর্তনীয় ও গতিহীন হিসাবে এক অবস্থায় স্থির থাকেনি। যা অপরিবর্তনীয় ও গতিহীন হিসাবে বদ্ধজলার অবস্থা প্রাপ্ত হয় তা শুধু তার মৃত্যুকেই ডেকে আনে। আর টিকে থাকে, প্রাণশক্তি বজায় রাখতে সক্ষম হয় তা যা গতিশীল। একটা ধর্মীয় চিন্তা, সভ্যতা বা জাতি ততক্ষণই গতিশীল ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর থাকে যতক্ষন অন্যের কাছ থেকে গ্রহণ করতে শিখতে এবং নিজের কালজীর্ণ ধ্যান-ধারণাগুলিকে বর্জন করতে সক্ষম হয়।

ঐতিহ্যসূত্রে পাওয়া ভারতীয় এই মহান চিন্তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং আজকের অবস্থার সৃষ্টিশীল ভাবে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে একে প্রয়োগ করতে হবে। এই মহান ও উদার চিন্তাই হাজার হাজার বছরের প্রাচীন এই দেশটিকে এর অসংখ্য বৈচিত্র সত্বেও ঐক্যবদ্ধ ও সংহত থাকতে সাহায্য করেছে। আমাদের বিশ্বাস এই ঐতিহ্যগত চিন্তাধারা যা আমরা সচেতন বা অচেতন যেভাবেই হোক না কেন কম বেশী বহন করে চলেছি তা ভবিষ্যৎ ভারতের ঐক্য ও সংহতিকেও বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

এখন কি করণীয় ?

ভারতে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার সমাধানের প্রশ্নে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন—

১। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির সমস্যা ভারতের বাস্তব অবস্থার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক কারণের মধ্যেই এর মূল নিহিত আছে। ফলে, এটা একটা বহু বিস্তৃত ও দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিতে বাধ্য। সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতি-সত্বার চেতনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই কারণে আরও নতুন নতুন ক্ষেত্রে জাতি সত্বার স্বীকৃতির দাবি দেখা দিলে তাতে বিস্মিত হবার কিছু থাকবে না।

২। ভারতে ভাষার সংখ্যা কয়েকশত। কিছু ভাষার নিজস্ব লিপি আছে আবার বহু ভাষার কোন লিপিই নেই। বিভিন্ন ভাষা ক্রমেই উন্নত হচ্ছে। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ বা রাজ্য গঠনের ইচ্ছা আকাঙ্খা অযৌক্তিক নয় এবং সাধারণ ভাবে নীতি-হিসাবে তা আমাদের মেনে নিতেই হবে। ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত ও উন্নত ভাষাগুলির ভিত্তিতে রাজ্য গঠিতও হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি ভাষার ভিত্তিতেই পৃথক রাজ্য গঠন করাতে হলে কয়েকশত রাজ্যে ভারতকে বিভক্ত করতে হয়—যা এইভাবে গঠিত অতি ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে যেমন ক্ষতিকর হবে তেমনই তাতে গভীরভাবে বিঘ্নিত হবে জাতীয় ঐক্য সংহতি। এই কারণে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠনের নীতিটি বিশেষ করে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষাভাষিদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে না।

৩। প্রধান ভাষাগুলির ভিত্তিতে রাজ্য গঠন এবং ঐসব ভাষাগুলিকে রাজ্যের প্রশাসনিক কাজ ও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা যেমন প্রতিটি জাতির সুষ্ঠ অগ্রগতির পক্ষে প্রয়োজনীয়

তেমনই সমগ্র ভারতের অগ্রগতি—যার উপরে রাজ্যগুলির উন্নয়নও নির্ভরশীল– তার জন্য এবং সমগ্র ভারতের ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যোগাযোগের ভাষাকে (link language) গুরুত্ব দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। ভারতে যদি ইংরাজী, ফরাসী, রুশ বা চৈনিক ভাষার মত কথ্য. ও লেখ্য উভয় ক্ষেত্রে কোন শক্তিশালী ভাষা থাকত তবে তা ভারতের ঐক্য ও সংহতির ক্ষেত্রে মূল্যবান ভূমিকা পালনে সক্ষম হতো। ভারতে সর্বভারতীয় যোগাযোগের ভাষা হিসাবে হিন্দীর দাবী সর্বাগ্রগণ্য কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হিন্দী ভাষা কথ্য ভাষা হিসাবে যতটা কার্যকরী লেখ্য ভাষা হিসাবে, সাহিত্যের ভাষা হিসাবে তা এখনো প্রয়োজনীয় মর্যাদার আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়নি। উপরন্তু সমগ্র উত্তর ভারতে হিন্দী বিশাল জনসমষ্টির মাতৃভাষা হলেও দক্ষিণ ভারতে এর প্রচলন সীমিত। যার ফলে এ পর্যন্ত হিন্দী ভাষা সর্বভারতীয় যোগাযোগের ভাষা হিসাবে সংবিধান অনুসারে গৃহীত হলেও কর্মক্ষেত্রে সমস্ত ভারতীয়দের দ্বারা গৃহীত হয়নি।

বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে ভাষার ব্যাপারে স্পর্শকাতরতা হিন্দী বিদ্বেষের জন্ম দিয়েছে এবং বেশ কয়েকবার হিন্দী বিরোধী হিংসাত্মক দাঙ্গাও সেখানে হয়ে গেছে। এটা অবশ্যই জাতীয় ঐক্য ও সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর।

কেউ কেউ মনে করেন যে এই স্পর্শকাতরতাকে প্রশয় না দিয়ে প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে উচিত ছিল আইন করে প্রতিটি রাজ্যকে হিন্দীকে লিঙ্ক ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে গ্রহণ করান এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য করান। প্রথমেই এই দুর্বলতাকে প্রশয় দেবার ফলেই আজ এটা একটা অনমনীয় সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য হিন্দী ভাষাকে সর্বভারতীয় লিঙ্ক ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার দাবি পিছিয়ে দিতে হচ্ছে।

সে যাই হোক, জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নটি মাথায় রেখে এ বিষয়ে যারা সচেতন তাদের প্রত্যেকের উচিত সারা ভারতে এবং বিশেষ করে নিজ নিজ রাজ্যে হিন্দী ভাষার বহুল প্রচলনের জন্য তৎপরতাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করা। বর্তমানে সারা ভারতে হিন্দী ভাষা প্রচলনের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসাবে দেখা যাচ্ছে হিন্দী সিনেমা এবং দূরদর্শনের জাতীয় কর্মসূচীকে কাজ করতে। এর সঙ্গে হিন্দী ভাষা শিক্ষার ব্যপক ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে পঃ বাংলায় হিন্দী বিদ্বেষ বলে কিছু নেই কিন্তু হিন্দী ভাষা সম্পর্কে আমাদের অনীহা ও উন্নাসিকতা অস্বীকার করার নয়। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির বিষয়ে যারা সচেতন তাদের অবশ্য হিন্দী ভাষা শিক্ষার জন্য পঃ বাংলায় ব্যবস্থা গ্রহণে অগ্রনী হতে হবে। হিন্দী ভাষাকে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষাগুলির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সম্পাদকে হিন্দীতে উপযুক্তভাবে অনুবাদ করা এবং তা ভর্তুকী দিয়ে কমদামে বিক্রীর ব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধির পক্ষে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ।

৪। এখন পর্যন্ত প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত সাহিত্য ও পুস্তকের বিষয়বস্তু নিজ নিজ জাতীয় গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অপর জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতি ও অন্যান্য বিষয়ে আমরা জানি খুবই কম এবং এই অজ্ঞানতার ফলে ভারতীয় অন্যান্য জাতি ও উপজাতি সম্পর্কে গড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে বহু ভুল ও ক্ষতিকর ধারণা। বিহারী, উড়িয়া, সাঁওতালি, নেপালী, অসমীয়া, নাগা, মিজো প্রভৃতি জাতি উপজাতি সম্পর্কে আমরা বাঙ্গালীরা প্রায় কিছুই জানি না। এবং এই অজানার সুযোগে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশি এইসব জাতিগুলি সম্পর্কে আমাদের মধ্যে নানা ভুল ও ক্ষতিকর ধারণা অত্যন্ত প্রকট। জাতীয় সংহতি অভিমুখে আমাদের পক্ষে অবিলম্বে বাংলা ভাষায় এবং প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষায় অন্যান্য

জাতি ও উপজাতিগুলি সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলিতে পুস্তক প্রকাশনার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এবং তা যাতে সম্ভব হয় তারজন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা দানের ব্যবস্থা একান্ত জরুরী।

৫। ধর্ম সম্পর্কে আমাদের দেশের মানুষ অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর। একথা মনে রেখে আমাদের নেতৃবৃন্দ ধর্মের গোঁড়ামী অন্ধসংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে নীরব থাকেন এবং সেই সুযোগে মৌলবাদীরা অবাধে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াবার সুযোগ পায়। এই ধরণের মনোভাব পরিত্যাগ করে ধর্মীয় কুসংস্কার, যে কোন ধরনের বাড়াবাড়ি, ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়াস, প্রভৃতির যুক্তিসম্মত ও জোরাল সমালোচনা করা আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এই মুহূর্তে পাঞ্জাবের শিখ গুরদোয়ারার প্রবন্ধকরা ধর্মীয় গোড়ামিকে যেভাবে উত্তেজিত করে তুলছে এবং রাজ্যরাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মকে প্রধান স্থানে প্রতিষ্ঠা করে ভারতের রাষ্ট্রিয় ধর্ম-নিরপেক্ষতার আদর্শকে ক্ষুন্ন করছে সারাদেশ জুড়ে সকল সংস্থা ও প্রভাবশালী ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার তীব্র সমালোচনা হওয়া উচিত।

৬। ধর্মীয় কুসংস্কার বিষয়ে ১৯৬৭ সালে রুরকী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ইন্দিরা গান্ধীর প্রদত্ত ভাষণ আমাদের সর্বদাই মনে রাখা প্রয়োজন। তিনি বলেছিলেন ঃ

"বিজ্ঞান সংস্কার বদ্ধতা ও অন্ধ-বিশ্বাসের শত্রু। আমাদের অতীতের সবকিছুকে বিনা প্রশ্নে শ্রদ্ধা করাটাই হ'লো অন্ধ-বিশ্বাস। কোন একটি জাতি বা ধর্ম অপর সকলের চেয়ে উন্নত এমন ধারণাটাই হ'লো সংস্কার-বদ্ধতা। কোন একটা চিন্তাধারা যা কোন এক ঐতিহাসিক পর্য্যায়ে কার্যকরী হয়েছে তা সর্বদেশে সর্বকালে কার্যকরী হবে মনে করাটাই অন্ধবিশ্বাস। বিজ্ঞান, অপর পক্ষে পরিবর্তনের পক্ষপাতি। বহুকারণে অন্ধবিশ্বাস আমাদের মধ্যে প্রবেশ করছে

এবং নতুন নতুন সমর্থক পেয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া ধর্মীয় বিদ্বেষের রোগ-বীজাণু থেকে মুক্ত হবার আশা আমি দেখিনা। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদদের মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান-মনস্কতা সৃষ্টি করার মহান দায়িত্ব নিতে হবে—যেন আমাদের অগ্রগতি অন্ধ-বিশ্বাসের জগদ্দল পাথরে বাধাপ্রপ্ত না হয়।"

মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান-মনস্কতা, যুক্তিবাদ, মানবধর্মী তা ও ভাগ্য বা দৈবানুগ্রহ নয় মানুষের সৃষ্টিশীল ক্ষমতায় গভীর বিশ্বাস-এসব চিন্তাধারা ও চেতনার বিকাশ ঘটানর দায়িত্ব শুধু বৈজ্ঞানিকদের নয় বিজ্ঞান-মনস্ক সকল চিন্তাশীল মানুষের। জাতীয় সংহতির কর্মীদের শুধুমাত্র "জাতীয় ঐক্য ধর্মীয় ঐক্য" বলে চিৎকার করলেই হবেনা সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান ভিত্তিক আধুনিক চিন্তাধারা সম্প্রসারণের জন্য সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

৭। সর্বধর্ম-সমন্বয়, সবার উপরে মানুষ সত্য, মানব-ধর্ম মানব-সেবা মানব-প্রেমই হ'লো সকল ধর্মের সার কথা—এইসব মহান আদর্শ আমাদের দেশের মনীষী ও সাধকরা যা প্রচার করে গেছে, এবং প্রাচীন ভারতীয় সর্বমত ও পথ সম্পর্কে সহনশীলতা ও শ্রদ্ধার আদর্শ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে সর্বস্তরের জনসাধারনের কাছে আমাদের তুলে ধরতে হবে।

৮। বহুকাল ধরে পশ্চাদপদ ছিল যেসব উপজাতিগুলি এবং যাদের মধ্যে ধীরে ধীরে জাতিসত্বার চেতনা ও স্বাধীকারবোধের উন্মেষ ঘটছে তাদের আশা-আকাঙ্খা ও সমস্যাগুলির প্রতি গভীর-ভাবে নজর দিতে হবে ; তাদের ঐতিহ্যগত ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি আমাদের আন্তরীক শ্রদ্ধা নিয়ে তার বিকাশের এবং সেইসঙ্গে তাদের মধ্যেকার কুসংস্কার সঙ্কীর্ণতা ও অনাদিবাসী মানুষের প্রতি তাদের যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করে আদিবাসী ও অনাদিবাসী মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে হবে।

৯। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত 'আপনা উৎসবের' মত প্রতিটি রাজ্যে তার নিকট প্রতিবেশীদের জাতি উপজাতি গত লোক-সংস্কৃতিকে উৎসাহিত ও পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করার জন্য উৎসবের ব্যবস্থা করতে হবে। এরজন্য সরকারী ও বেসরকারী মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

১০। সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যপকভাবে ভারতের ইতিহাস ভূগোল ও আধুনিক বিজ্ঞান ও বিশ্ব ও বহির্বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান অডিও ভিস্যুয়াল, ভিডিও-ক্যাসেট প্রভৃতির মাধ্যমে ছড়িয়ে দেবার ব্যপক ব্যবস্থা করতে হবে।

১১। শত পুষ্প শত পথ বিকশিত হোক ভারতের সকল ধর্ম, সকল ভাষা সকল জাতি-উপজাতি নিজ নিজ বৈশিষ্ট সংরক্ষণ করেও ভারতীয় হয়ে উঠুক—জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিষয়ে ভারতের মহান ঐতিহাসিক এই নীতি ব্যপক ভাবে প্রচারিত হোক।